অধ্যায়-১

সিমেন্ট কংক্রিট এবং কাঠামোর নিরাপত্তা

(Cement Concrete and Structural Safety)

১.০ বিভিন্ন প্রকার সিমেন্ট কংক্রিটের কাজ (Different types of cement concrete works) ঃ

কংক্রিট (Concrete) ঃ কংক্রিট একপ্রকার জমাটবদ্ধ কৃত্রিম পাথরবিশেষ। নির্দিষ্ট অনুপাতে সিমেন্ট, খোয়া বা পাথরের টুকরা, বালি এবং পানি একত্রে মিশ্রিত করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জমাট বাঁধিয়ে এটা তৈরি করা হয়। খোয়া এবং বালিকে অ্যাগ্রিগেট বলে। বর্তমানকালে কংক্রিট বলতে মূলত সিমেন্ট কংক্রিট বা প্লেইন কংক্রিট (Plain concrete)-কে বুঝায়। অর্থাৎ সিমেন্ট, অ্যাগ্রিগেট এবং পানিকে সঠিক অনুপাতে মিশ্রিত করে কাঠামোর সুনির্দিষ্ট ছাঁচে জমাটবদ্ধ করলে যে পাথরসদৃশ কঠিন পদার্থ পাওয়া যাবে, তাকে প্লেইন কংক্রিট বা কংক্রিট বলে।

কংক্রিটের উপাদানসমূহকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়, যথা–

(ক) নিষ্ক্রিয় পূরক পদার্থ (Aggregates) ঃ যেমন– ইট বা পাথরের খোয়া, বালি, সুড়কি ইত্যাদি।

(খ) সংযোজক পদার্থ (Binding materials) ঃ যেমন– সিমেন্ট, চুন, বিটুমেন ইত্যাদি।

(গ) সাহায্যকারী পদার্থ (Helping materials) ঃ যেমন– বিশুদ্ধ পানি।

(ক) নিষ্ক্রিয় পূরক পদার্থ (Aggregates) ঃ যে-সকল পদার্থ কেবলমাত্র কংক্রিটের আয়তন বৃদ্ধি করে অর্থাৎ পূরক (Filler) পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাদেরকে অ্যাগ্রিগেট বলে। এ সকল পদার্থ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না বলে এদের নিষ্ক্রিয় পদার্থও বলে। কংক্রিটের মোট আয়তনের 70–75% ভাগ আয়তন অ্যাগ্রিগেট দখল করে। বাকি আয়তন জমাটবদ্ধ সিমেন্ট পেস্ট, পানি এবং বাতাসের দ্বারা ভয়েড পূর্ণ থাকে। এটা আবার দু'ভাগে বিভক্ত, যথা–

১। মোটা দানা (Coarse aggregate)

২। সরু দানা (Fine aggregate)।

১। মোটা দানা (Coarse aggregate) ঃ অ্যাগ্রিগেটের কণাগুলো যদি 4 নং চালুনি বা 4.75 মিমি ($\frac{3}{16}''$) চালুনির ছিদ্র দিয়ে অতিক্রম না করে, তবে সেগুলোকে মোটা দানা (Coarse aggregate) পূরক পদার্থ বলে। সর্বোচ্চ 10% কোর্স অ্যাগ্রিগেটের আকার এর চেয়ে ছোট হতে পারবে। কোর্স অ্যাগ্রিগেট কংক্রিটের প্রধান উপাদান। কারণ, কোর্স অ্যাগ্রিগেট কংক্রিটের আয়তনবর্ধক, ঘাতসহ ও চাপ সহ্যকারী পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কাজের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কোর্স অ্যাগ্রিগেটের আকার নির্ধারণ করা হয়। ড্যাম (Dam) জাতীয় বৃহৎ কাজে সর্বোচ্চ 20 সেমি এবং সাধারণ কংক্রিটের কাজে 63 মিমি আকারের কোর্স অ্যাগ্রিগেট ব্যবহার করা হয়। আরসিসি কাজে সাধারণত 20 মিমি আকারের অ্যাগ্রিগেট ব্যবহার করা হয়।

শক্ত পাথরের টুকরা এবং গ্র্যাভেল সাধারণত অ্যাগ্রিগেট হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে পাথরে কুচি খুব সীমিত মাত্রায় পাওয়া যায় বলে 1 নং পিকেড (Picked) ইটের টুকরা কোর্স অ্যাগ্রিগেট হিসাবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে ইটকে পানিতে 24 ঘণ্টা যাবৎ ভিজিয়ে রাখলে যদি 10% ভাগের বেশি ওজন বৃদ্ধি পায়, তবে সেরূপ খোয়া ব্যবহার না করাই উত্তম। কংক্রিটে ব্যবহৃত অ্যাগ্রিগেট অবশ্যই পরিচ্ছন্ন, ত্রিভুজাকৃতি, শক্ত এবং জৈব পদার্থমুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২। সরুদানা (Fine aggregate) ঃ যে-সকল অ্যাগ্রিগেট 4.75 মিমি ($\frac{3}{16}''$) বা 4 নং চালুনি দিয়ে অতিক্রম করবে, তা সরু দানা বা ফাইন অ্যাগ্রিগেট। প্রাকৃতিক বালি, পাথরের কুচি, পেবলস, সিন্ডারস, স্লাগ ইত্যাদি সরু দানার পূরক পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কংক্রিটে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরু দানার পূরক পদার্থ অবশ্যই তীক্ষ্ণ দানাবিশিষ্ট, পরিচ্ছন্ন, শক্ত ও জৈব পদার্থমুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর আকার সাধারণত চালুনি বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিরূপণ করা হয়। সরু দানার পূরক পদার্থ গ্রেডিং করার সাধারণ বিনির্দেশ হলো– 95%–100% পূরক পদার্থ অবশ্যই 4 নং বা 4.75 মিমি চালুনি অতিক্রম করবে এবং 30% এর অধিক নয় ও 10% এর কম নয় পূরক পদার্থ অবশ্যই 50 নং চালুনি অতিক্রম করবে। তবে সর্বোচ্চ 5% ফাইন অ্যাগ্রিগেটের আকার, উপরোক্ত আকারের চেয়ে বড় হতে পারবে।

Scanned with AnyScanner

(খ) সংযোজক পদার্থ (Binding materials) ঃ কংক্রিটের বিভিন্ন উপাদানগুলোকে একত্রে ধরে রাখার জন্য আঠালো ও বন্ধন গুণবিশিষ্ট যে পদার্থ এর উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাকে সংযোজক পদার্থ বলে। সংযোজক পদার্থ হিসাবে বিভিন্ন পদার্থ ব্যবহার করা হয়; যেমন– সিমেন্ট, চুন, অ্যাসফল্ট এবং টার।

প্রকৌশল কাজে সাধারণত সিমেন্টকে জমাট বাঁধাইকারী উপাদান বা সংযোজক পদার্থ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কংক্রিটের বিভিন্ন উপাদানসমূহকে একত্রে ধরে রাখাই হলো সিমেন্টের কাজ। সুতরাং, সিমেন্ট হলো সংযোজক বা আসঞ্জনশীল সামগ্রী : এটা নিষ্ক্রিয় অ্যাগ্রিগেটকে বন্ডের মাধ্যমে পর্যাপ্ত শক্তিসম্পন্ন সলিড পিণ্ডে পরিণত করে। এর অ্যাডহেসিভ (বিভিন্ন পদার্থের মধ্যে আসঞ্জন ক্ষমতাসম্পন্ন) এবং কোহেসিভ (একজাতীয় পদার্থের মধ্যে আসঞ্জন ক্ষমতাসম্পন্ন) গুণাবলি রয়েছে। এছাড়াও সিমেন্ট, ফাইন অ্যাগ্রিগেটের মধ্যস্থ সূক্ষ্মতর ফাঁকা স্থানসমূহ পূর্ণ করে।

আবিষ্কৃত হাইড্রোলিক সিমেন্টসমূহের মধ্যে স্ট্রাকচারাল কংক্রিট তৈরির কাজে একমাত্র পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট (Portland Cement) সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। ১৮২৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে প্রথম প্যাটেন্ট আকারে পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট আবিষ্কার করা হয়, যা বর্তমানে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট প্রধানত ক্যালসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট সংবলিত ধূসর বর্ণের মিহি গুঁড়া পদার্থ। এটা সাধারণত CaO সম্বলিত চুনাপাথর (Lime Stone) এর দুভাগ এবং SiO_2 ও Al_2O_3 সংবলিত ক্লে বা শেল-এর একভাগ পদার্থ মিশ্রিত করে গুঁড়া করা হয়। অতঃপর ঐ গুঁড়া 1400°C হতে 1500°C তাপে উত্তপ্ত করলে ক্লিঙ্কার (Clinker)-এ পরিণত হয়। ঠান্ডা হলে এ ক্লিংকার-এর সাথে পরিমাণমতো জিপসাম মিশিয়ে মিহি করে গুঁড়া করলে কৃত্রিম সিমেন্ট পাওয়া যায়।

সিমেন্টের কেবলমাত্র হাইড্রেশন (রাসায়নিক বিক্রিয়া) সম্পন্ন করতে এর ওজনের 25% পানির প্রয়োজন হয়। অতিরিক্ত 10-15% পানি সিমেন্ট পেস্টের মধ্য দিয়ে হাইড্রেশন প্রসেস চলাকালীন সময়ে সমস্ত সিমেন্ট কণায় পানি চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হয় ফলস্বরূপ ন্যূনতম ওয়াটার সিমেন্ট রেশিও (Water-cement ratio) এর মান 0.35 থেকে 0.40 (ওজনে) হয়ে থাকে। এ হিসাবে প্রতি ব্যাগ সিমেন্টের জন্য 18.2 থেকে 20.5 লিটার (4 থেকে 4.5 গ্যালন) পানির প্রয়োজন।

(গ) সাহায্যকারী পদার্থ (Helping materials) ঃ কংক্রিট প্রস্তুতে পানি রাসায়নিক বিক্রিয়ার সহায়ক পদার্থ হিসাবে কাজ করে বলে এটাকে সাহায্যকারী পদার্থ বলা হয়। সিমেন্ট পানির সংস্পর্শে আসলে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে জমাট বাঁধে। পানি, বালি, সিমেন্ট ও মোটা দানার সংগে মিশ্রণে পিচ্ছিলতা প্রদান করে। রাসায়নিকভাবে পানি, সিমেন্ট, বালি ও খোয়ার সঙ্গে আবদ্ধকারী পেস্ট তৈরি করে, যা মোটা দানা ও লৌহকে যুক্ত রাখে। তাই এমন পানি ব্যবহার করা উচিত, যা রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সাহায্যকারী হয়। কংক্রিটের কাজে ব্যবহারের জন্য পানি বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। সাধারণত খাওয়ার উপযোগী পানি কংক্রিটে ব্যবহার করা শ্রেয়। তবে কংক্রিটে কোনো অবস্থাতেই অধিক অম্লযুক্ত বা 5% এর অধিক লবণযুক্ত পানি ব্যবহার করা উচিত নয়। সমুদ্রের পানি কংক্রিটে ব্যবহারের অনুপযুক্ত।

প্লেইন কংক্রিট (Plain concrete) ঃ কংক্রিট বলতে মূলত প্লেইন কংক্রিটকে বুঝায়। সিমেন্ট, বালি, ইটের বা পাথরের খোয়া দিয়ে পানিসহ নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিয়ে এই কংক্রিট প্রস্তুত করা হয়। এটা সংকোচন চাপে খুবই শক্তিশালী। কিন্তু টেনশন বা প্রসারণ চাপে তত শক্তিশালী নয়। এর প্রসারণ চাপ প্রতিরোধক ক্ষমতা সংকোচন চাপ প্রতিরোধক ক্ষমতার প্রায় 10%, যা বাস্তবে বিবেচনা করা হয় না। তবে এর শিয়ার চাপ প্রতিরোধক ক্ষমতা সংকোচন চাপ প্রতিরোধক ক্ষমতার তুলনায় কম হলেও বিবেচনা করা হয়।

রিইনফোর্সড কংক্রিট (Reinforced concrete) ঃ সাধারণ কংক্রিট টানে খুব ভঙ্গুর এবং দুর্বল, যদিও চাপ সহ্যক্ষমতা অনেক বেশি। এটা শিয়ারেও তুলনামূলকভাবে বেশ দুর্বল। কংক্রিট যদি কাঠামোর এমন স্থানে ব্যবহৃত হয়, যেখানে তাকে টান ও শিয়ার বল সহ্য করতে হয়, তাহলে এর মধ্যে লোহার রড ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের কংক্রিটকে জোরদার কংক্রিট (Reinforced Cement Concrete) বা সংক্ষেপে আরসিসি (RCC) বলে। কংক্রিট ঢালাইয়ের পূর্বেই প্রয়োজন অনুসারে গোলাকৃতি স্টিল রড রিইনফোর্স হিসাবে ফর্মায় নির্দিষ্ট অবস্থানে স্থাপন করা হয়। ঢালাইয়ের পর স্টিল রডসমূহ কংক্রিটের অন্যান্য উপাদান দ্বারা চারদিকে আবৃত হয় এবং জমে বেঁধে শক্ত হওয়ার পর একক অভিন্ন কঠিন বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। আরসিসি তে রড টানশক্তি এবং কংক্রিট সংকোচন শক্তি সরবরাহ করে। রড যাতে আগুন অথবা আবহাওয়ায় নষ্ট না হয় সে জন্য এর চারপার্শ্বে আবরণ (Covering) দেওয়া হয়।

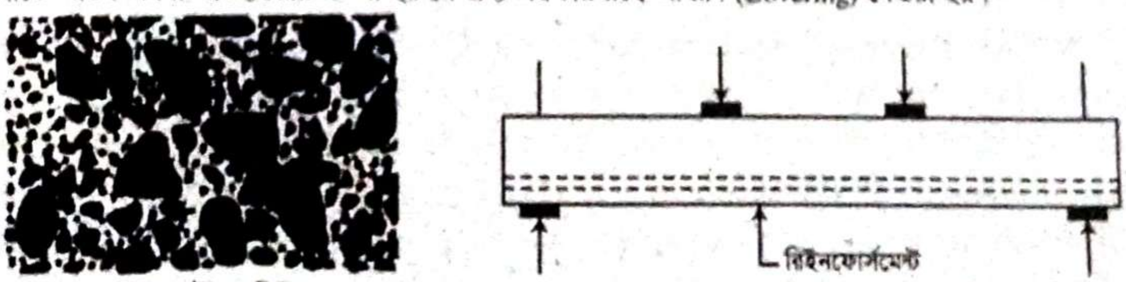

(ক) প্লেইন কংক্রিট (খ) রিইনফোর্সড কংক্রিট

চিত্র ঃ ১.১

Scanned with AnyScanner

প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট (Pre-stressed concrete) ঃ বর্তমানে অতি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কংক্রিট ও স্টিল ব্যবহারের মাধ্যমে এক বিশেষ ধরনের নির্মাণকাজের সম্ভব হয়েছে। একে প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট বলে। অর্থাৎ, যে কংক্রিটে এমন পরিমাণ ও বিস্তৃতির আভ্যন্তরীণ পীড়ন প্রবর্তন করা হয় যে, এটা বহিস্থ ভার হতে উদ্ভূত পীড়ন ঈপ্সিত মাত্রায় প্রশমিত করে, তাকে প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট বলে। আপতিত লোডের কারণে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কংক্রিট মেম্বারে উৎপন্ন বিকৃতি (Deformation), বিচ্যুতি (Deflection) ও অন্যান্য পীড়নসমূহকে সমন্বয় করার জন্য আপতিত লোড প্রয়োগের পূর্বেই পরিকল্পিতভাবে কংক্রিট মেম্বারের অভ্যন্তরে স্ট্রেস প্রদান করে যে মেম্বার নির্মাণ করা হয়, তাকে প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট মেম্বার বলে।

স্টিল তার (Wire) অথবা তারের দড়ি বা স্ট্র্যান্ডস (Strands) অথবা কখনও কখনও স্টিল বারকে কাঠামোর টেনশন জোনে স্থাপন করে ঢালাই করা হয়। কংক্রিট জমাট বেঁধে শক্ত হওয়ার পর স্টিলে পূর্বে আরোপিত উচ্চ টান এবং কংক্রিটে উচ্চ চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে সাম্যাবস্থায় থাকে। এরূপে কাঠামোর টান এলাকায় অতি উচ্চ সংকোচন চাপ পূর্বেই আরোপিত হওয়ার কারণে এর উপর আরোপিতভাবে উদ্ভূত টানের মাত্রা উক্ত সংকোচন (পূর্বে আরোপিত) চাপের মাত্রা অপেক্ষা অধিক না হওয়া পর্যন্ত টান এলাকায় টানজনিত কোনো ফাটল বা চির (Crack) সৃষ্টি হয় না।

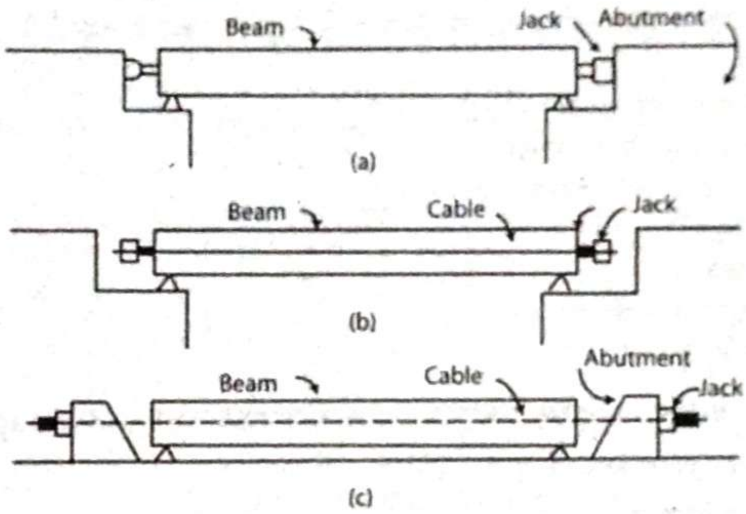

চিত্র ঃ ১.২ প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট

প্রি-স্ট্রেসিং অত্যন্ত সাফল্যের সাথে কাঠামোর ডিফ্লেকশন এবং টেনসাইল ক্র্যাক হ্রাস করে। এতে যে স্টিল ব্যবহার করা হয়, তার ইল্ড স্ট্রেংথ সাধারণ রিইনফোর্সিং স্টিলের ইল্ড স্ট্রেংথের তুলনায় 4 গুণ হয়ে থাকে। অন্যদিকে, সাধারণ কংক্রিটের তুলনায় কম্প্রেশনে 2–3 গুণ বেশি শক্তিশালী কংক্রিট উৎপাদন করা সম্ভব।

১.১ প্লেইন কংক্রিট, রিইনফোর্সড কংক্রিট এবং প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিটের ব্যবহার (Uses of plain concrete, reinforced concrete and pre-stressed concrete) ঃ

প্লেইন কংক্রিট-এর ব্যবহার ঃ প্লেইন কংক্রিট চাপা বল প্রতিরোধে খুবই শক্তিশালী এবং টান বল প্রতিরোধে খুবই দুর্বল। তাই যেখানে কংক্রিটকে বেশি চাপ সহ্য করতে হয়, সেখানে এটা ব্যবহার করা হয়, যেমন– ইটের বুনিয়াদের নিম্নস্তর, ভূসংলগ্ন মেঝে, কংক্রিট বাঁধ, কংক্রিট পিলার, কলাম, আর্চ ইত্যাদি।

রিইনফোর্সড কংক্রিট-এর ব্যবহার ঃ রিইনফোর্সড কংক্রিট চাপ এবং টান উভয় প্রকার বল প্রতিরোধে সক্ষম। তাই এ কারণে যে সমস্ত কাঠামোতে একই সঙ্গে চাপ এবং টান উভয় প্রকার পীড়নের সৃষ্টি, ঐ সমস্ত জায়গায় রিইনফোর্সড কংক্রিট ব্যবহার করা হয়; যেমন– স্ল্যাব, বিম, গার্ডার, ব্রিজ ইত্যাদি ফাঁকা জায়গায় নির্মাণ করা হয় বা ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া যেখানে কাঠামোর চাপ বেশি পড়ে, অথচ কংক্রিটের সে চাপ সহ্য করার মতো ক্ষমতা থাকে না, সেখানে রিইনফোর্সড কংক্রিট ব্যবহার করে চাপ সহ্যক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়, যেমন ঃ কলাম। আধুনিককালে এটা খুব জনপ্রিয়।

প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিটের ব্যবহার ঃ বর্তমানে বৃহৎ নির্মাণকাজে বা যেখানে স্থানান্তর খরচ কম এবং শাটারিং দুঃসাধ্য, সেখানে কাঠামো নির্মাণে প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট ব্যবহারে আর্থিক সাশ্রয় হয়। এটা প্রধানত উচ্চ শক্তিসম্পন্ন স্ল্যাব, বিম, ব্রিজ, ড্যাম, পাইল, পোস্ট, পাইপ ইত্যাদি নির্মাণে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের বিদেশি দাতা দেশের সাথে যৌথভাবে নির্মিত কিছু কাঠামোতে প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট ব্যবহৃত হয়েছে; যেমন– বুড়িগঙ্গা নদীর উপর চীন মৈত্রী সেতু, মেঘনা সেতু, দাউদকান্দী সেতু, বাঘাবাড়ী সেতু, ব্রহ্মপুত্র নদের উপর সেতু, যমুনা সেতু, রূপসা সেতু ইত্যাদি। এ ছাড়াও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ইলেকট্রিক পোস্ট তৈরি করতে প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট ব্যবহার করা হচ্ছে।

Scanned with AnyScanner

১.২ প্লেইন কংক্রিটের সুবিধা, অসুবিধা এবং সীমাবদ্ধতাসমূহ (Advantages, disadvantages & limitations of plain concrete) :

প্লেইন কংক্রিটের সুবিধাসমূহ :

১। যে-কোনো আকার-আকৃতিতে ঢালাই করা যায়।
২। এটা শক্ত, মজবুত এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়।
৩। এর উপাদানসমূহ সহজলভ্য।
৪। সংকোচন চাপবাহী কাঠামো হিসাবে খুবই শক্তিশালী।
৫। এটা উচ্চমাত্রায় অগ্নি ও আবহাওয়া প্রতিরোধক।
৬। শব্দ ও তাপ প্রতিরোধক।
৭। ঘর্ষণ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন শক্ত পৃষ্ঠ প্রদান করে।
৮। নির্মাণখরচ তুলনামূলকভাবে কম।
৯। রক্ষণাবেক্ষণ খরচ কম।

প্লেইন কংক্রিটের অসুবিধাসমূহ :

১। টান বল সহ্যক্ষমতা খুবই কম।
২। উপাদানের আনুপাতিককরণের তারতম্যে, অতিরিক্ত পানি প্রয়োগে, উৎকৃষ্ট মানের উপাদানের অভাব হলে ঈপ্সিত শক্তিসম্পন্ন হয় না।
৩। নির্মাণকালে উত্তম তদারকির প্রয়োজন হয়।
৪। ফাটল দেখা দিলে মেরামত করা কষ্টসাধ্য।
৫। শিয়ার সহ্য করার ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে খুবই দুর্বল।
৬। তুলনামূলকভাবে ভঙ্গুর।

প্লেইন কংক্রিটের সীমাবদ্ধতা :

১। সব ধরনের কাঠামো নির্মাণ করা যায় না।
২। ডিজাইন ছাড়া নির্মাণ ঝুঁকিপূর্ণ।

১.২.১ রিইনফোর্সড কংক্রিটের সুবিধা, অসুবিধা এবং সীমাবদ্ধতাসমূহ (Advantages, disadvantages & limitation of reinforced concrete) :

রিইনফোর্সড কংক্রিটের সুবিধাসমূহ :

১। উপাদানসমূহ সহজলভ্য।
২। সংকোচন ও প্রসারণ চাপবাহী কাঠামো হিসাবে খুবই শক্তিশালী, মজবুত, ফলপ্রসূ এবং দীর্ঘস্থায়ী।
৩। আবহাওয়া ও অগ্নিপ্রতিরোধক।
৪। রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত খরচ খুবই কম।
৫। যে-কোনো আকার-আকৃতিতে সহজে ঢালাই করা যায়।
৬। উপাদানসমূহ আলাদাভাবে সহজে বহন উপযোগী এবং সহজেই সংগ্রহ করা যায়।
৭। উপাদানসমূহের অনুপাতের পরিবর্তন করে চাহিদানুযায়ী কম বা বেশি শক্তিশালী করা যায়।
৮। মধ্যম প্রকৃতির ভারবাহী এবং মধ্যম দৈর্ঘ্যের স্প্যানবিশিষ্ট কাঠামো নির্মাণে খুবই ফলপ্রসূ।
৯। শব্দ প্রতিরোধক ক্ষমতা বেশি।
১০। নির্মাণখরচ তুলনামূলকভাবে কম।

রিইনফোর্সড কংক্রিটের অসুবিধাসমূহ :

১। ফেটে গেলে বা ভেঙ্গে গেলে মেরামত করা দুঃসাধ্য।
২। নির্মাণকালে সতর্ক ও অভিজ্ঞ তদারকির প্রয়োজন হয়।
৩। ডিজাইন ও পরিকল্পনা অনেকক্ষেত্রে জটিল।
৪। রিইনফোর্সিং রডসমূহের শক্তি পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করা যায় না।
৫। কেবলমাত্র নিরপেক্ষ অক্ষের উপরে অথবা নিচের কংক্রিট চাপ প্রতিরোধে কার্যকরী হয় এবং অবশিষ্ট অংশ বাস্তবে প্রায় অকার্যকর থাকে।

রিইনফোর্সড কংক্রিটের সীমাবদ্ধতা :

১। দীর্ঘ স্প্যানের ক্ষেত্রে ডিজাইন করা ব্যয়বহুল।
২। রিইনফোর্সিং স্টিলের পূর্ণ শক্তি ব্যবহার সম্ভব নয়।

Scanned with AnyScanner

১.২.২ প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিটের সুবিধা, অসুবিধা এবং সীমাবদ্ধতাসমূহ (Advantages, disadvantages and limitations of pre-stressed concrete) ঃ

প্রি-স্ট্রেস্ড কংক্রিট-এর সুবিধাসমূহ ঃ

১। কংক্রিটের সর্বোচ্চ চাপশক্তি এবং স্টিলের সর্বোচ্চ টানশক্তি সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হয় বলে এর সেকশন অনেক ছোট হয় এবং আর্থিক সাশ্রয় হয়।

২। অধিক ভারবাহী এবং দীর্ঘ স্প্যানবিশিষ্ট কাঠামোর ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী।

৩। স্টিল রিইনফোর্সমেন্টে প্রি-স্ট্রেস প্রদান করায় ও তা যথাযথভাবে অ্যাংকর করার ফলে এ জাতীয় কাঠামোতে ফাটল সৃষ্টি হয় না।

৪। প্রি-স্ট্রেসড কংক্রিট মেম্বারের সেকশন ছোট হওয়ায় কাঠামোর নিজস্ব ওজন বহুলাংশে হ্রাস পায়। ফলে ফাউন্ডেশনে খরচ কম হয়।

৫। অতি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন কংক্রিট ও স্টিল ব্যবহারের ফলে এ জাতীয় কাঠামোর আকার ছোট হওয়ার কারণে নির্মাণসামগ্রীর কংক্রিট ও স্টিলের পরিমাণ কম লাগে।

৬। ছোট সেকশনবিশিষ্ট মেম্বারগুলো হাল্কা বলে সহজেই বহন করা যায়।

৭। ডায়াগোনাল টেনশন কমানো যায়।

৮। বাঁকা টেনডন (Curve tendons) ব্যবহার করে প্রি-স্ট্রেসড মেম্বারের শিয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়।

৯। রক্ষণাবেক্ষণ খরচ খুবই কম।

১০। আবহাওয়া ও অগ্নিপ্রতিরোধক।

প্রি-স্ট্রেসড্ কংক্রিট-এর অসুবিধাসমূহ ঃ

১। প্রি-স্ট্রেস্ড কংক্রিটে উচ্চ শক্তিসম্পন্ন নির্মাণসামগ্রীর প্রয়োজন হয় বলে প্রাথমিক নির্মাণখরচ তুলনামূলকভাবে বেশি হয়।

২। এর জন্য বিশেষ যন্ত্রপাতি ও মালামালের প্রয়োজন হয়; যেমন– জ্যাক, অ্যাংকরেজ ডিভাইস, কন্ডুইট ইত্যাদি।

৩। অনেক বেশি কারিগরি জ্ঞান থাকা এবং উত্তম পরিদর্শনের প্রয়োজন।

৪। উচ্চ গ্রেডের সিমেন্ট কংক্রিট প্রস্তুতের সময় অভিজ্ঞ ও দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন।

৫। এতে অতিরিক্ত ফর্মওয়ার্ক-এর প্রয়োজন হয়।

প্রি-স্ট্রেসড্ কংক্রিটের সীমাবদ্ধতা ঃ

১। নিম্ন মানসম্পন্ন উপকরণ দ্বারা নির্মাণ করা যায় না।

২। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ কর্মী ছাড়া নির্মাণ করা যায় না।

৩। যে-কোনো কাঠামোর ক্ষেত্রে নির্মাণ করা দুঃষ্কর।

৪। নির্মাণসামগ্রীর স্থানান্তর, উঠানামা এবং যন্ত্রপাতি বহন করা কষ্টকর।

১.৩ কংক্রিটের ইয়ং স্থিতিস্থাপক গুণাংক (Young modulus of elasticity of concrete) ঃ

স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে কংক্রিটের পীড়ন-বিকৃতি রেখার ঢালকে মডুলাস অব ইলাস্টিসিটি বা স্থিতিস্থাপক গুণাংক (Modulus of elasticity) বলে।

অর্থাৎ, $E = \tan\theta$

প্রকৃতপক্ষে, প্রাথমিক ভার অর্পণে কংক্রিটের স্থিতিস্থাপক গুণাংক নির্দেশক পীড়ন-বিকৃতির অনুপাত $f'c$ এর ধ্রুব মান প্রদান করে না। কারণ, কংক্রিটের পীড়ন-বিকৃতি বাঁকের প্রাথমিক অংশ সঠিক সরল রেখা নয়, এটা সরল রেখার কাছাকাছি অর্থাৎ প্রায় সরল রেখা। এ কারণে কংক্রিটের পীড়ন-বিকৃতি বাঁক হতে দু'টি নিয়মে স্থিতিস্থাপক গুণাংক নিরূপণ করা হয়; যথা–

(ক) অধিবৃত্তাকার পীড়ন পদ্ধতি (Parabolic stress method)

(খ) সরল রেখা পীড়ন পদ্ধতি (Straight line stress method)।

অধিবৃত্তাকার পদ্ধতিতে বাঁকের শুরু বিন্দুতে বাঁকের উপর স্পর্শক অংকন করা হয়। বাঁকের উপর অংকিত এ স্পর্শকের ঢালকে প্রাথমিক বা স্পর্শক গুণাংক (Initial or tangent modulus) বলা হয়। অপরদিকে, সরল রেখা পদ্ধতিতে বাঁকের শুরু বিন্দু হতে $0.5 f'c$ বিন্দু পর্যন্ত সংযোজক জ্যা-এর ঢালকে সিক্যান্ট স্থিতিস্থাপক গুণাংক (Secant modulus of elasticity) বলে। স্থিতিস্থাপক গুণাংক বলতে সিক্যান্ট স্থিতিস্থাপক গুণাংককে বুঝায়।

Scanned with AnyScanner

ACI কোড অনুযায়ী সিক্যান্ট স্থিতিস্থাপক গুণাংক ঃ

মেট্রিক পদ্ধতি ঃ

$E_c = W^{1.5} 4270 \sqrt{f'c}$ কেজি/বর্গ সেমি

এখানে, W = কংক্রিটের একক ওজন = 2.4 টন/ঘনমিটার

$f'c$ = কংক্রিটের সর্বোচ্চ পীড়ন, কেজি/বর্গ সেমি

এফপিএস পদ্ধতি ঃ

$E_c = W^{1.5} 33 \sqrt{f'c}$

অথবা, $E_c = 57000 \sqrt{f'c}$

এখানে, W = কংক্রিটের একক ওজন = 150 পাঃ/ঘনফুট

$f'c$ = কংক্রিটের সর্বোচ্চ পীড়ন, পাঃ/বর্গইঞ্চি

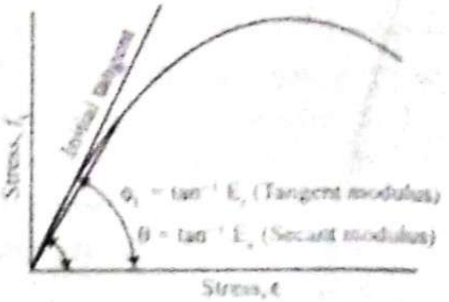

চিত্র ঃ ১.৩

১.৩.১ কংক্রিটের পীড়ন, বিকৃতি, সর্বোচ্চ পীড়ন এবং অনুমোদিত পীড়ন (Stress, strain, ultimate stress and allowable stress of concrete)

পীড়ন (Stress of concrete) : কোনো বস্তুর উপর বাহির থেকে বল প্রয়োগ করলে বস্তুটি তার আকার অপরিবর্তিত রাখার জন্য বস্তুর অভ্যন্তরে যে প্রতিক্রিয়া-বলের সৃষ্টি হয়, তাকে পীড়ন বলে। অর্থাৎ,

আমরা জানি,

$$\text{পীড়ন} = \frac{\text{প্রয়োগকৃত বল}}{\text{প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল}}$$

$$\therefore f = \frac{P}{A}$$

এখানে,

f = পীড়ন

P = প্রযুক্ত লোড

A = ক্ষেত্রফল

পীড়নের শ্রেণিবিন্যাস :

১। **চাপ পীড়ন (Compressive stress) :** কোনো বস্তুর উপর চাপ বল প্রয়োগে যে পীড়ন সৃষ্টি হয়, তাকে চাপ পীড়ন বলে।

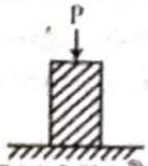

চিত্র ঃ ১.৪ চাপ পীড়ন

২। **টান পীড়ন (Tensile stress) :** বস্তুর উপর টান বল প্রয়োগে যে পীড়ন উৎপন্ন হয়, তাই টান পীড়ন।

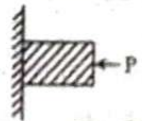

চিত্র ঃ ১.৫ টান পীড়ন

৩। **শিয়ার পীড়ন (Shear stress) :** বল প্রয়োগে কাঠামোর এক অংশ অন্য অংশ হতে বিচ্ছিন্ন হওয়া বা ছিঁড়ে যাওয়ার প্রবণতায়, প্রতি একক ক্ষেত্রফলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়াকে শিয়ার পীড়ন বলে।

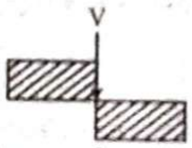

চিত্র ঃ ১.৬ শিয়ার পীড়ন

বিকৃতি (Strain) : বল প্রয়োগে বস্তুর পরিমাপ ও আকৃতির একক পরিবর্তনকে বিকৃতি বলে।

$$\text{বিকৃতি} = \frac{\text{পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য}}{\text{মূল দৈর্ঘ্য}} = \frac{dL}{L}$$

কংক্রিটের সর্বোচ্চ পীড়ন (Ultimate stress of concrete) : যে সর্বোচ্চ সীমারেখা পর্যন্ত কংক্রিটের পীড়ন বৃদ্ধি পায় এবং ঐ সীমারেখার পর পীড়ন বৃদ্ধি না পেয়ে বরং হ্রাস পেতে থাকে, সর্বোচ্চ সীমারেখার এই সংশ্লিষ্ট পীড়নকে সর্বোচ্চ পীড়ন বলে। একে $f'c$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

কংক্রিটের অনুমোদনযোগ্য পীড়ন (Allowable stress of concrete) : স্থিতিস্থাপক সীমার মধ্যে কংক্রিট যে পরিমাণ পীড়ন নিরাপদে বহন করতে পারে, তাকে কংক্রিটের অনুমোদনযোগ্য পীড়ন বলে, অনুমোদনযোগ্য পীড়ন, $fc = 0.45 f'c$

Scanned with AnyScanner

১.৩.২ কংক্রিটের ইয়ং স্থিতিস্থাপক গুণাংক নির্ণয় (Determining the young modulus of elasticity of concrete) ঃ

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলি

কংক্রিটের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক,

$E_c = W^{1.5}\, 4270\sqrt{f'c}$ (MKS System)

$E_c = W^{1.5}\, 33\sqrt{f'c}$ (FPS System)

মডুলার রেশিও, $n = \frac{E_s}{E_c}$

এখানে,

W = কংক্রিটের একক ওজন (MKS unit) = 2.4 Ton/m^3 = 2400kg/m^3

W = কংক্রিটের একক ওজন (FPS unit) = 150lb/ft^3 = 150 pcf

$f'c$ = কংক্রিটের সর্বোচ্চ পীড়ন (kg/cm^2)

E_s = স্টিলের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক

E_c = কংক্রিটের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক।

উদাহরণ-১। কংক্রিটের সর্বোচ্চ চাপ পীড়ন 250kg/cm^2 হলে E-এর মান কত হবে? [বাকাশিবো-২০২০]

সমাধান ঃ

আমরা জানি,

$E_c = W^{1.5}\, 4270\sqrt{f'c}$

$= (2.4)^{1.5} \times 4270 \times \sqrt{250}$

= 2.51,024 kg/cm^2 **(Ans.)**

ধরি,

W = 2.4 Ton/m^3

দেওয়া আছে,

$f'c$ = 250kg/cm^2

উদাহরণ-২। প্রতি ঘনমিটার কংক্রিটের ওজন 2350 কেজি এবং সর্বোচ্চ চাপ পীড়ন 200 kg/cm^2 হলে, স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্ক নির্ণয় কর। [বাকাশিবো-২০১৩, ১৫, ২০(পরি)]

সমাধান ঃ আমরা জানি,

$E = W^{1.5}\, 4270\sqrt{f'c}$

$= (2.4)^{1.5} \times 4270 \times \sqrt{200}$

= 217542.77 kg/cm^2 **(Ans.)**

দেওয়া আছে,

W = 2350 kg/m^3

= 2.350 Ton/m^3

f'c = 200 kg/cm^2

উদাহরণ-৩। একটি কংক্রিট নমুনার সর্বোচ্চ চাপশক্তি 210 kg/cm^2 এবং একক ওজন 2400 kg/m^3। স্টিলের মডুলাস অব ইলাস্টিসিটি, E_s = 2039000 kg/cm^2 হলে মডুলার রেশিও নির্ণয় কর। [বাকাশিবো-২০১০, ১৪, ১৬(পরি), ১৮]

অথবা, স্টিলের মডুলাস অব ইলাসটিসিটি $E_s = 2.037 \times 10^5$ kg/cm^2 এবং কংক্রিটের ওজন 2400 kg/m^3 হলে মডুলার রেশিও নির্ণয় কর। কংক্রিটের সর্বোচ্চ পীড়ন f_c = 210 kg/cm^2। [বাকাশিবো-২০১৮(পরি)]

সমাধান ঃ আমরা জানি,

মডুলার রেশিও, $n = \frac{E_s}{E_c}$

E_c = কংক্রিটের মডুলাস অব ইলাস্টিসিটি

$= W^{1.5}\, 4270\sqrt{f'c} = (2.4)^{1.5} \times 4270 \times \sqrt{210}$

= 230067.03 কেজি/বর্গ সেমি

$\therefore n = \frac{E_s}{E_c} = \frac{2039000}{230067.03} = 8.86 = 9$ **(Ans.)**

এখানে, E_s = স্টিলের মডুলাস অব ইলাস্টিসিটি

= 2039000 কেজি/বর্গ সেমি

কংক্রিটের একক ওজন, W = 2400 kg/m^3

= 2.4 Ton/m^3

উদাহরণ-৪। কোন একটি কংক্রিটের নমুনার সর্বোচ্চ চাপশক্তি 210kg/cm^2 এবং একক ওজন 2300kg/m^3 হলে স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কের মান নির্ণয় কর।

অথবা, কংক্রিটের সর্বোচ্চ পীড়ন 211 kg/cm^2 হলে কংক্রিটের স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কের মান কত? [বাকাশিবো-২০১৭]

অথবা, কংক্রিটের সর্বোচ্চ চাপ পীড়ন 211 kg/cm^2 হলে স্থিতিস্থাপক গুণাঙ্কের মান নির্ণয় কর। [বাকাশিবো-২০২১(পরি)]

সমাধান ঃ

আমরা জানি,

$E = W^{1.5}\, 4270\sqrt{f'c}$

$= (2.3)^{1.5} \times 4270 \times \sqrt{210}$

= 215838.68 kg/cm^2 **(Ans.)**

দেওয়া আছে,

W = 2300 kg/m^3 = 2.3 Ton/m^3

f'c = 210 kg/cm^2

Scanned with AnyScanner

উদাহরণ-৫। **কংক্রিটের একক ওজন 2.4 টন/ঘনমিটার এবং সর্বোচ্চ পীড়ন, $f'c$ = 176 কেজি/বর্গ সেমি হলে স্থিতিস্থাপক গুণাংক কত হবে?**

সমাধান ঃ আমরা জানি,

$$E = W^{1.5}\, 4270\sqrt{f'c}$$
$$= (2.4)^{1.5} \times 4270 \times \sqrt{176}$$
$$= 210620.74 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Ans.)}$$

উদাহরণ-৬। **কংক্রিটের একক ওজন 2.323 টন/ঘনমিটার এবং সর্বোচ্চ পীড়ন, $f'c$ = 211 কেজি/বর্গ সেমি হলে E-এর মান কত হবে?**

সমাধান ঃ

আমরা জানি, $E = W^{1.5}\, 4270\sqrt{f'c}$

$$= (2.323)^{1.5} \times 4270 \times \sqrt{211}$$
$$= 219605 \text{ kg/cm}^2 \text{ (Ans.)}$$

উদাহরণ-৭। **কংক্রিটের একক ওজন 150 lb/ft³ এবং সর্বোচ্চ পীড়ন 3200 psi হলে কংক্রিটের ইয়ং মডুলাস কত?**

সমাধান ঃ

আমরা জানি,

$$E_c = W^{1.5}\, 33\sqrt{f'c}$$
$$= 150^{1.5} \times 33 \times \sqrt{3200}$$
$$= 3429460.60 \text{ psi (Ans.)}$$

দেয়া আছে,

$W = 150 \text{ lb/ft}^3$

$f'c = 3200$ psi

১.৪ কংক্রিটের চাপশক্তি পরীক্ষায় কিউব ও সিলিন্ডারের বিচূর্ণন পদ্ধতি বর্ণনা (Test procedure of crushing concrete cubes and cylinders for compression test) ঃ

কিউব/সিলিন্ডার তৈরি ঃ 150 মিমি × 150 মিমি × 150 মিমি আকারের কিউব এবং 150 মিমি ব্যাস ও 300 মিমি উচ্চতা বিশিষ্ট সিলিন্ডার এর ছাঁচ একটি শক্ত ও সমতল পৃষ্ঠের উপর স্থাপন করতে হয়। 6 মিমি গ্লাস প্লেট বা 12 মিমি মেটাল প্লেটকে এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। অতঃপর সদ্য প্রস্তুতকৃত কংক্রিট মিশ্রণ দ্বারা সমপুরুত্বে তিন স্তরে ভর্তি করতে হয়। প্রত্যেক স্তরের পুরুত্ব ছাঁচের উচ্চতার $\frac{1}{3}$ অংশ হওয়া উচিত। প্রতিটি স্তর ভর্তি করার পর, 16 মিমি ব্যাসবিশিষ্ট এবং 900 মিমি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট নিম্নপ্রান্ত সুচালো স্টিল রড দ্বারা 25 বার আঘাতের মাধ্যমে দৃঢ়াবদ্ধ করা হয়। সর্বশেষ ভর্তি করে রডিং করার পর উপর প্রান্তে ট্রাওয়েল দ্বারা সমান করে গ্লাস বা মেটাল প্লেট দ্বারা ঢেকে রাখতে হয়। 2 – 4 ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর এর উপরিপৃষ্ঠ নীট সিমেন্টের পাতলা প্রলেপ প্রয়োগ করে আবার ঢেকে রাখতে হয়। ঘনক বা সিলিন্ডার প্রস্তুতির সময়, পানি-সিমেন্ট অনুপাত, স্ল্যাম্প এর পরিমাণ, ঢালাইয়ের তারিখ, কংক্রিটের উপাদান ইত্যাদি তথ্য লিখে রাখতে হয়।

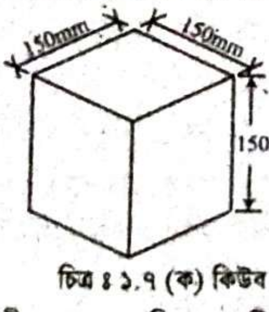

চিত্র ঃ ১.৭ (ক) কিউব

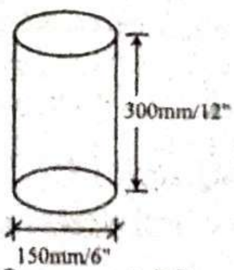

চিত্র ঃ ১.৭ (খ) সিলিন্ডার

চাপশক্তি পরীক্ষার জন্য প্রতিবারে ৩টি করে কিউব অথবা সিলিন্ডার প্রস্তুত করা হয়। তিনটি সিলিন্ডার অথবা কিউবকে এক সেট সিলিন্ডার বা কিউব বলে। চাপশক্তি পরীক্ষার মাধ্যমে কংক্রিটের সর্বোচ্চ চাপশক্তি নির্ণয় করা হয়।

কিউরিং ঃ কিউব/সিলিন্ডার ঢালাই করে 24 ঘণ্টা পর্যন্ত কার্যক্ষেত্রে রাখতে হয়। অতঃপর ছাঁচ থেকে কিউব/সিলিন্ডার বের করার পর পরীক্ষা করে স্থানান্তর করা হয়। পরীক্ষাগারে 70°± 5°F বা 21°±1.5°C তাপমাত্রায় সিক্ত আবহাওয়ায় কিউরিং করা হয়। সাধারণত 7 দিন, 14 দিন অথবা 28 দিন কিউরিং করার পর পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার 24–48 ঘণ্টা পূর্বে কিউরিং করা বন্ধ করতে হয়।

Scanned with AnyScanner

পরীক্ষা : কংক্রিট সিলিন্ডার বা কিউবের নিম্ন ও উপরিতল যদি সমতল না থাকে, তবে সমতল করার জন্য ক্যাপিং কম্পাউন্ড (সালফার-সিলিকা কম্পাউন্ড, শেল্যাক কম্পাউন্ড/জিপসাম কম্পাউন্ড) ব্যবহার করতে হবে। এর অভাবে কমপক্ষে এক ঘন্টা পূর্বে নীট সিমেন্ট প্লাস্টার দ্বারা সমতল করা যেতে পারে। নিখুঁত কাজের জন্য শক্ত রাবার প্যাড ব্যবহার করতে হবে। নমুনার তলের মাপ নিয়ে ক্ষেত্রফল বের করতে হবে। নমুনাটি এমনভাবে মেশিনে বসাতে হবে যেন মেশিনের সরবরাহকৃত লোড তার কেন্দ্র বরাবর পড়ে। ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন বা কংক্রিট টেস্টার মেশিনের সাহায্যে এ কাজ করা হয়। নমুনা কিউব বা সিলিন্ডার টেস্টিং মেশিনে স্থাপনের পর এতে যে পর্যন্ত না বিচূর্ণ হয়, সে পর্যন্ত চাপা বল প্রয়োগ করতে হয়। সাধারণত মেশিন চালু করে ধারাবাহিকভাবে প্রায় প্রতি সেকেন্ডে এক কেজি/বর্গ সেমি হারে লোড প্রয়োগ করতে হয়। ভাঙ্গার সময় সর্বোচ্চ লোড লিপিবদ্ধ করতে হবে। যে লোডে নমুনাটি বিচূর্ণ হয়, একে নমুনার প্রস্থচ্ছেদীয় ক্ষেত্রফল দ্বারা ভাগ করলে কিউব বা সিলিন্ডারের সর্বোচ্চ চাপশক্তি (Ultimate compressive strength) বা সর্বোচ্চ পীড়ন পাওয়া যায়। একে সাধারণত কেজি/বর্গ সেমি এককে প্রকাশ করা হয়। রিইনফোর্সড কংক্রিট ডিজাইনে কংক্রিটের সর্বোচ্চ চাপশক্তিকে সাধারণত f′c দ্বারা বুঝানো হয়।

কিউব টেস্টে সাধারণত সিলিন্ডার টেস্টে প্রাপ্ত শক্তির প্রায় 20% থেকে 30% বেশি পাওয়া যায়। ব্রিটিশ পদ্ধতিতে কিউব এবং আমেরিকান পদ্ধতিতে সিলিন্ডার পরীক্ষা করা হয়।

তবে সিলিন্ডার টেস্ট নিম্নবর্ণিত কারণে বেশি নির্ভরশীল :

১। সিলিন্ডার টেস্টে নমুনায় বিচূর্ণন এর কৌণিক প্রতিবন্ধকতা দ্বারা কম প্রভাবিত হয়।

২। সিলিন্ডার নমুনার শক্তি এর মোটা পূরক পদার্থের গুণাগুণের দ্বারা কম প্রভাবিত হয়।

৩। কিউব অপেক্ষা সিলিন্ডার নমুনার যে-কোনো অনুভূমিক তলে পীড়ন বিতরণ বেশি সমভাবাপন্ন।

ACI কোড অনুযায়ী প্রতি পরীক্ষার জন্য 28 দিনের দু'টি করে নমুনা পরীক্ষা করতে হয়। তবে প্রতি 115 ঘনমিটার (150 ঘনগজ) কংক্রিটের জন্য দু'টি অথবা 465 বর্গমিটার (5000 বর্গফুট) ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট প্রতিদিনের কাজের জন্য কমপক্ষে একটি করে সিলিন্ডার নমুনা পরীক্ষা করা উচিত।

ACI কোড অনুযায়ী কংক্রিটের গুণাগুণ সন্তোষজনক হবে, যদি–

১। একটি টেস্টের (দু'টি সিলিন্ডার) ফলাফলের গড় শক্তি অবশ্যই সুনির্দিষ্ট f′c এর কম হবে না।

২। পর্যায়ক্রমিক তিনটি পরীক্ষার ফলাফলের গড় শক্তি অবশ্যই সুনির্দিষ্ট f′c এর সমান অথবা বেশি হবে।

WSD এবং USD উভয় পদ্ধতিতে f′c এর মান সাধারণত 211 কেজি/বর্গ সেমি (3000 পাঃ/বর্গইঞ্চি বা 20.7 MPa) ধরা হয়।

উদাহরণ-৮। একটি আদর্শ কংক্রিট কিউব নমুনা ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিনে পরীক্ষার করার সময় 550 kN লোডে চূর্ণ করা হলো। কংক্রিটের f′c এর মান নির্ণয় কর। [বাকাশিবো-২০১২]

সমাধান : দেওয়া আছে,

বিচূর্ণন লোড, $P = 550$ kN

$= 550 \times 1000$ N

$= \dfrac{550 \times 1000}{9.81}$ [1 kg = 9.81 N]

$= 56065.24$ kg

আমরা জানি,

আদর্শ কিউব = 15 cm × 15 cm × 15 cm

কিউবের ক্ষেত্রফল, $A = a^2$

$= 15^2$

$= 225\ cm^2$

∴ কংক্রিটের সর্বোচ্চ পীড়ন, $f'c = \dfrac{P}{A} = \dfrac{56065.24}{225}$

$= 249.17\ kg/cm^2$ **(Ans.)**

উদাহরণ-৯। আদর্শ কংক্রিট সিলিন্ডার নমুনা Universal Testing Machine-এ পরীক্ষা করার সময় 550 kN লোডে চূর্ণ করা হলো, কংক্রিটের f′c-এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান : আমরা জানি,

আদর্শ সিলিন্ডারের ব্যাস = 15cm

সিলিন্ডারের ক্ষেত্রফল, $A = \dfrac{\pi \times d^2}{4} = \dfrac{\pi \times 15^2}{4}$

$= 176.785\ cm^2$

কংক্রিটের সর্বোচ্চ পীড়ন, $f'c = \dfrac{P}{A} = \dfrac{56065.24}{176.785} = 317.14\ kg/cm^2$ **(Ans.)**

ধরি,

$P = 550$ kN

$= 550 \times 1000$ N

$= \dfrac{550 \times 1000}{9.81}$ kg

[1kg = 9.91 kN]

$= 56065.24$ kg

Scanned with AnyScanner

১.৫ রিকটার স্কেল, সিসমোগ্রাফ, টেকটোনিক প্লেট এবং ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র (Richter scale, seismograph, tectonic plate and epicenter) ঃ

রিকটার স্কেল (Richter scale) ঃ

ভূমিকম্পের মাত্রা নিরূপণে বহুল পরিচিত রিকটার স্কেল ব্যবহৃত হয়। ১৯৩৫ সালে California Institute of Technology এর Charles Richter ক্যালিফোর্নিয়ার ভূমিকম্পের বিশালতা বর্ণনা করতে একটি সংখ্যা বাশি রেখাচিত্র আবিষ্কার করেন। বৃহৎ ভূমিকম্পে পৃথিবীতে বড় ধরনের ঝাঁকুনি অনুভূত হয়, এ ধারণার উপর ভিত্তি করে রিকটার তার স্কেল তৈরি করেন, যা সিসমোগ্রাম (Seismogram) এর উপর অধিক বিস্তৃতির (Amplitude) রেখা তৈরি হয়। তিনি এ সম্পর্ককে আদর্শায়িত করে ভূমিকম্পের মাত্রা সংজ্ঞায়িত করেন। ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে 100 কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে আদর্শ সিসমোগ্রাফে (Seismograph) রেকর্ডকৃত সর্বোচ্চ ভূকম্পিয় তরঙ্গের বিস্তার (মিলিমিটারের হাজার ভাগে)-কে Log_{10}-এ প্রকাশ করে মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভূকম্পিয় তরঙ্গ এর বিস্তার 10, 000 গুণ বৃদ্ধি পেলে (10 × 10 × 10 × 10), রিকটার মাত্রা ৪ এর মধ্যে 4-এ উন্নীত হবে।

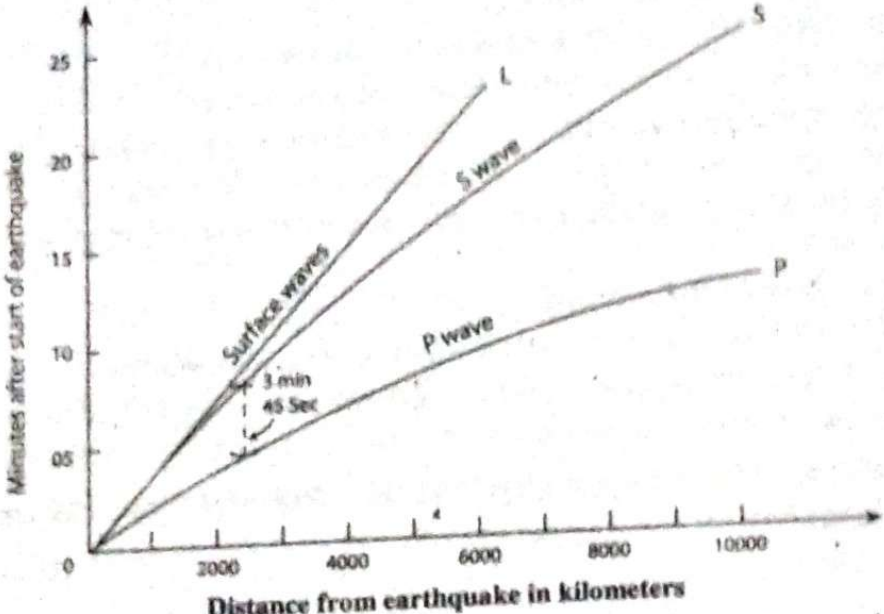

Plot of travel time versus distance for seismic waves. Note that the arrival time difference for P and S waves of 3 minutes and 45 seconds in the figure corresponds to a distance of about 2,250 km.

চিত্র ঃ ১.৮ (ক)

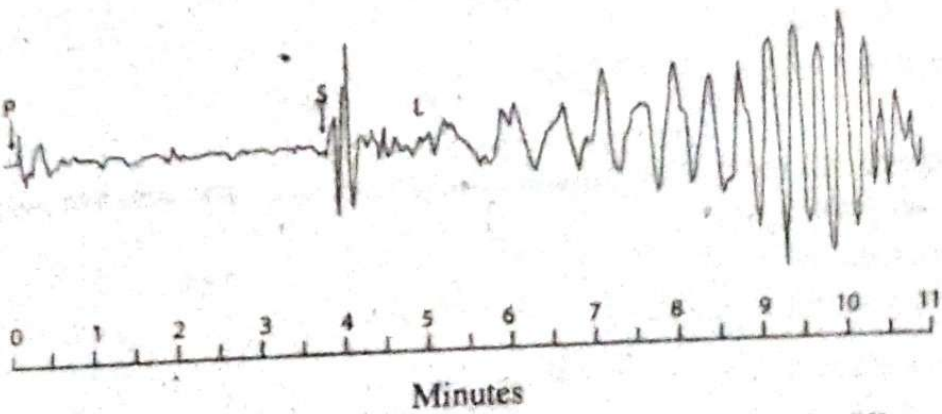

Seismogram recorded in Russia in 1909 of an Asia Minor earthquake. Notice that the difference in arrival times of P and S waves (S-P) is 3 minutes and 45 seconds.

চিত্র ঃ ১.৮ (খ)

Scanned with AnyScanner

রিকটার স্কেলে ভূমিকম্পের নাম :

- সর্বনাশা (Catastrophic) : 8 বা তার চেয়ে বেশি
- ধ্বংসাত্মক (Destructive) : 7 থেকে 7.9
- শক্তিশালী (Strong) : 6 থেকে 6.9
- মধ্যম (Moderate) : 5 থেকে 5.9
- হালকা (Light) : 4 থেকে 4.9
- মৃদু (Minor) : 3 থেকে 3.9
- খুবই মৃদু (Very minor/feeble) : 2 থেকে 2.9
- যান্ত্রিক (Instrumental) : 0 থেকে 1.9

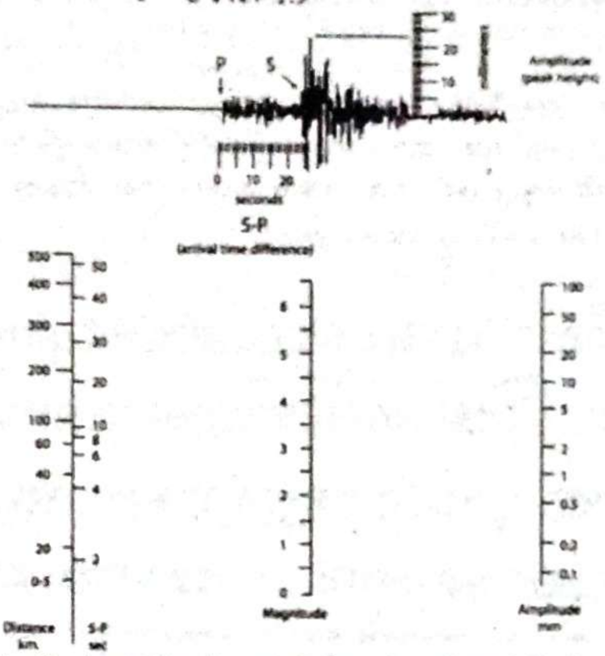

Nomograph of the Richter scale allowing earthquake magnitudes to be estimated. On the seismogram, read the difference in arrival times of a P and S waves in seconds, and plot the value on the left column of the nomograph. Next read the amplitude of the peak height of the S wave and plot this value on the right column. Draw a line between the two marked values and it will pass through the earthquake magnitude on the center column.

চিত্র : ১.৯

সিসমোগ্রাফ (Seismograph) :

ভূকম্পন এবং এর তীব্রতা নিরূপণের জন্য সাধারণত সিসমোগ্রাফ (Seismograph) এবং রিকটার স্কেল (Richter scale) ব্যবহৃত হয়। সিসমোগ্রাফের সাহায্যে ভূত্বকের অনুলিপি প্রস্তুত করা সম্ভব। অপরদিকে, এর সাহায্যে ভূকম্পের মাত্রা নিরূপণ করা যায়। সাধারণত সিসমোগ্রাফের সাহায্যে ভূকম্পিয় তরঙ্গ পরিমাপ করা হয়।

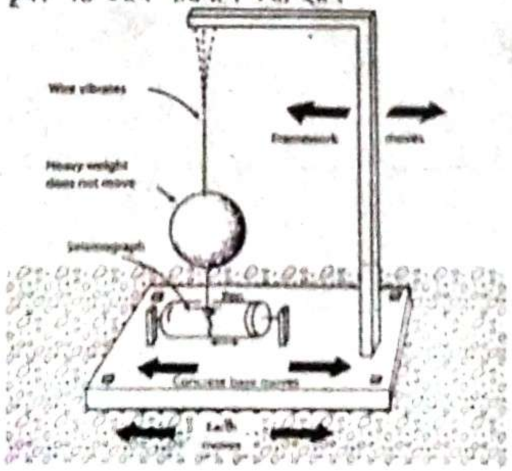

A basic seismograph. The Earth moves, the seismograph framework moves, the hanging wire vibrates, but the suspended heavy mass and pen beneath it remain relatively steady ideally. The pen holds still while the Earth moves beneath the pen to produce an inked line.

চিত্র : ১.১০ seismograph

Scanned with AnyScanner

তরঙ্গ বা ঢেউ (Waves) ঃ

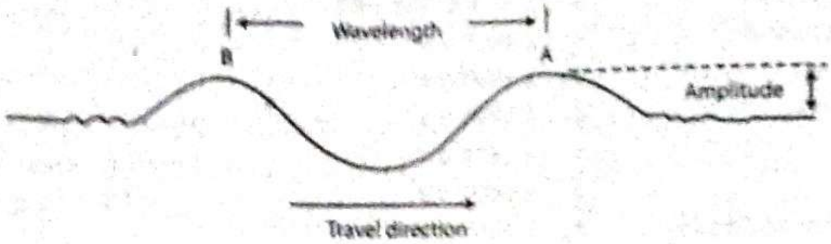

Wave motion. Amplitude is the height of the wave above the starting point. Wavelength is the distance between wave crests B & A. Period is the amount of time in seconds for wave crest B to travel to site A.

চিত্র ঃ ১.৭ Wave motion

চিত্রানুযায়ী সব ঢেউ এক ধরনের। এদের স্থান পরিবর্তন (Displacement)-কে বিস্তার (Amplitude) এবং পর পর দুটি তরঙ্গের মধ্যবর্তী দূরত্বকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য (Wavelength) বলে। আর একক সময় বা প্রতি সেকেন্ডে দুটি তরঙ্গের মধ্যবর্তী দূরত্বকে দোলনকাল (Period of time) এবং একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে থেকে প্রতি সেকেন্ডে কতগুলো তরঙ্গ অতিক্রম করে তার পরিমাপকে Frequency বলে। এর পরিমাপকে hertz বলে। 1 hertz = One cycle per sceond.

$$\text{Period} = \frac{1}{\text{frequency (in hertz)}}$$

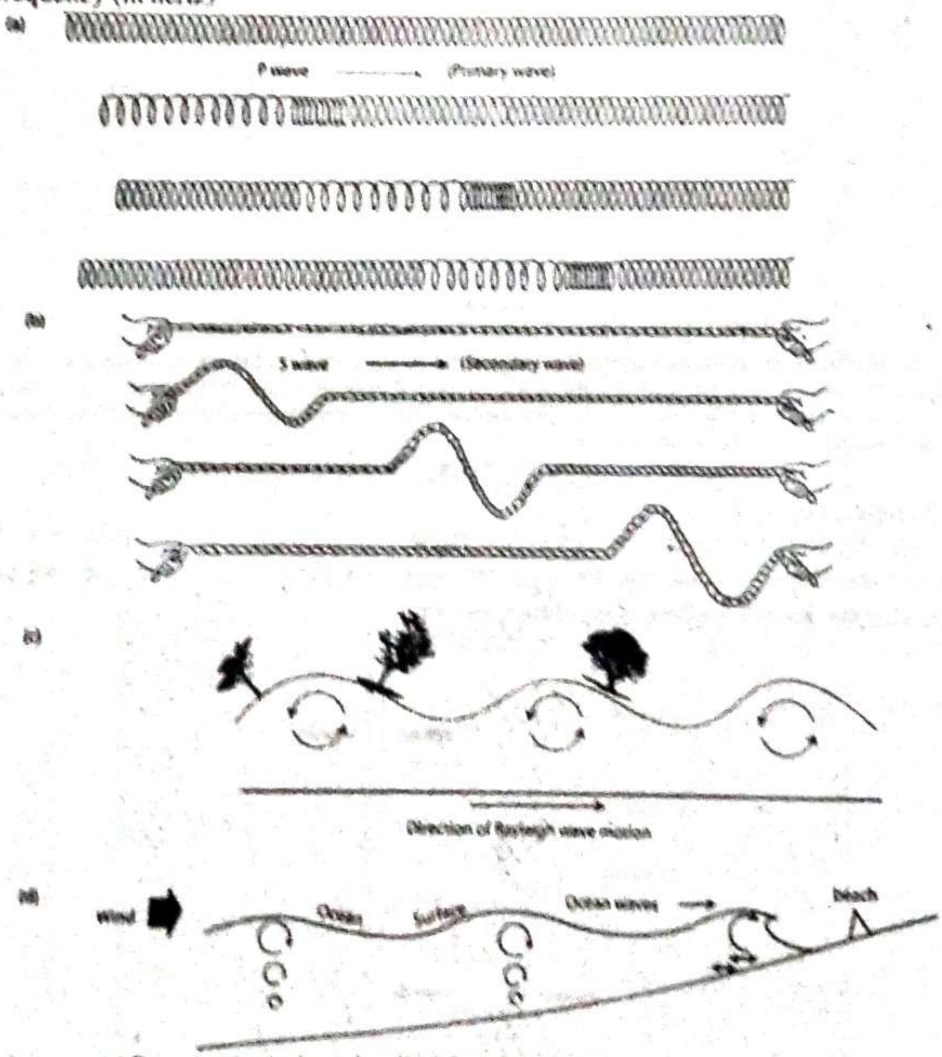

Types of seismic waves. (a) P waves mdve in the push-pull motion of a slinky toy. (b) S waves move in upand down motions perpendicular to the direction of advance. like a shaken jump rope (c) Raleigh waves advance in a backward rotating motion, as opposed to (d) wind blown ocean waves. which cause water to move in forward-rotating circles.

চিত্র ঃ ১.১১ seismic waves

টেকটোনিক প্লেট (Tectonic plate) ঃ

ভূত্বক প্রধানত কতকগুলো প্লেট দ্বারা নির্মিত। এসব প্লেটের ভূতাত্ত্বিক নাম টেকটোনিক প্লেট (Tectonic plate)। এটার অপর নাম লিথোস্ফেরিক প্লেট (Lithospheric plate)। এটা বৃহৎ, অসম আকৃতির শক্ত শিলার স্ল্যাব, যা ভূখণ্ড ও সামুদ্রিক লিথোস্ফেয়ার উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত। প্লেটের আকার কয়েকশত থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার হয়ে থাকে। প্যাসিফিক এবং অ্যান্ট্রাকটিক প্লেট (Pacific and Antractic Plates) সবচেয়ে বৃহৎ। প্লেটের পুরুত্ব 15 কিলোমিটার থেকে 200 কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্লেটের চারদিকের পুরুত্ব 100 কিলোমিটার এবং দুটি পদার্থ দ্বারা তৈরি। একটি সামুদ্রিক কঠিন স্তর (Oceanic crust) বা sima, যা silicon ও aluminium থেকে তৈরি। এছাড়াও অসংখ্যা সাব-প্লেট রয়েছে। প্লেটগুলো সবসময় সঞ্চালনশীল। প্লেটগুলো চলতে চলতে কখনো একটি অন্যটিকে অতিক্রম করলে কিংবা একটি অন্যটির উপরে আসলে তখনই ভূমিকম্প হয়। অর্থাৎ, প্লেট মুভমেন্টের কারণে ভূমিকম্প হয়।

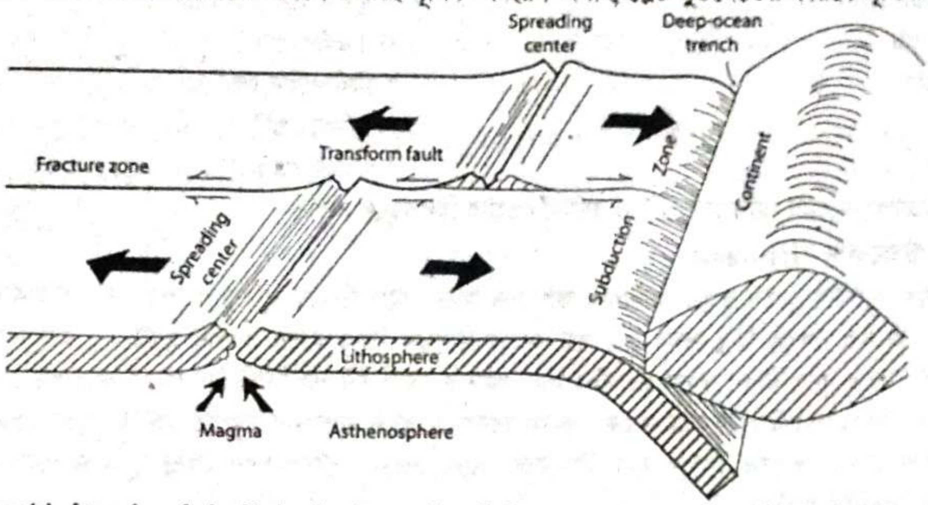

Plate-tectonics model of transform faults. Notice that the transform fault connects the two separated spreading centers, sea floor moves in opposite directions here. Beyond the spreading centers, the two plates move in the same direction and are separated by a fracture zone. there is no transform fault here.

চিত্র ঃ ১.১২ Plate-tectonics model of transform faults

টেকটোনিক প্লেটের প্রধান বৈশিষ্ট্য (Main features of tectonic plate) ঃ

১। ভূপৃষ্ঠ ধারাবাহিকভাবে বৃহৎ প্লেট দ্বারা গঠিত।
২। প্লেটগুলো প্রতি বছর ধ্রুব গতিতে কয়েক সেন্টিমিটার পর্যন্ত চলতে থাকে।
৩। সমুদ্রের তলদেশ অবিরাম সঞ্চালনশীল।
৪। প্লেটগুলো বিভিন্ন দিকে সঞ্চারণের ফলে প্লেটগুলোর অভ্যন্তরে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি হয়।
৫। বিদ্যুৎ প্রবাহ থেকে তাপ সঞ্চালিত হয়ে তেজস্ক্রিয়তা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং পৃষ্ঠ গর্তের সৃষ্টি হয়।
৬। প্লেটগুলো একে অপরের সংস্পর্শে আসলে ভূমিকম্প হয়।

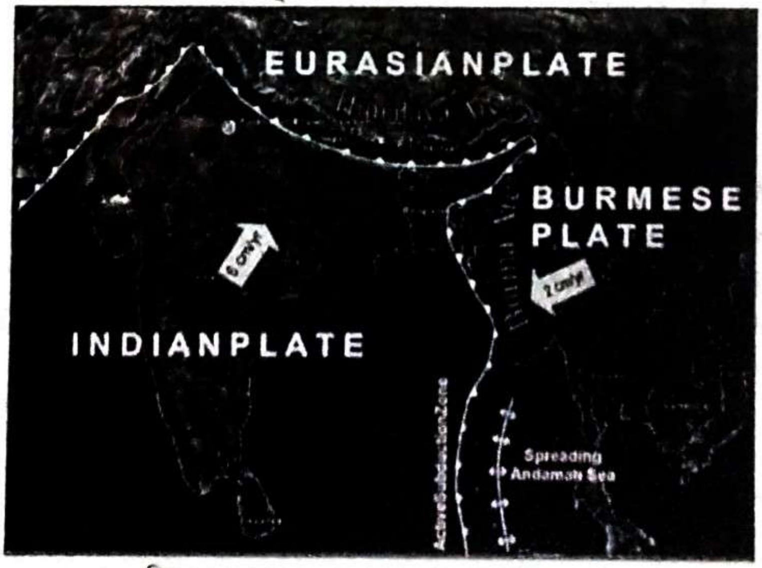

চিত্র ঃ ১.১৩ Major tectonic plates of the world

Scanned with AnyScanner

বর্তমানে টেকটোনিক প্লেটের শ্রেণিবিভাগ :

১। প্রাথমিক প্লেটসমূহ (Primary plates) :

অর্থাৎ বৃহত্তর প্লেটসমূহ নিম্নরূপ–

* আফ্রিকান প্লেট
* এন্টার্কটিকা প্লেট
* ইউরেশিয়া প্লেট
* ইন্দো-অস্ট্রেলিয়ান প্লেট
* নর্থ আমেরিকান প্লেট
* প্যাসিফিক প্লেট
* সাউথ আমেরিকান প্লেট।

২। দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত প্লেটসমূহ (Secondary plates) :

অর্থাৎ ক্ষুদ্রতর প্লেটসমূহ নিম্নরূপ–

* এরাবিয়ান প্লেট
* ক্যারিবিয়ান প্লেট
* ককোস প্লেট
* ইন্ডিয়ান প্লেট
* জুয়ান-ডি-ফুকা প্লেট
* নাজকা প্লেট
* ফিলিপাইন প্লেট
* স্কটিয়া প্লেট।
* বার্মিজ প্লেট।

বাংলাদেশ ইউরেশিয়ান প্লেট, ইন্ডিয়ান প্লেট ও বার্মিজ প্লেটের মিলনস্থলে অবস্থিত।

ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র (Epicenter) :

প্রাকৃতিক কারণে পৃথিবীর কঠিন ভূত্বক অকস্মাৎ ক্ষণিকের জন্য কেঁপে উঠাকে ভূমিকম্প বলা হয়। সাধারণত ভূমিকম্প কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়। অনেক ক্ষেত্রে কিছু সময় পর পর কম্পন অনুভূত হয়। এরূপ কম্পন খুবই মৃদু হয়। কখনো কখনো প্রচণ্ড কম্পনও হয়ে থাকে। এতে করে ভীষণ ধ্বংস সংঘটিত হয়। অনেক গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোনো একটি স্থানে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়ে থাকে। ভূ-অভ্যন্তরে যে স্থানে কম্পনের উৎপত্তি, তাকে কেন্দ্র (Centre or focus) বলা হয়। কেন্দ্রের সোজা উপরে ভূপৃষ্ঠস্থ বিন্দুর নাম উপকেন্দ্র (Epicentre)। ভূমিকম্পের কেন্দ্র ভূ-অভ্যন্তরের প্রায় 10 থেকে 20 কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত থাকে।

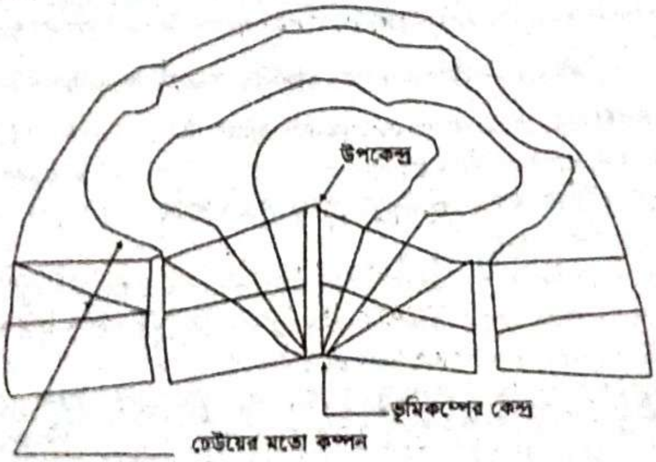

চিত্র : ১.১৪

ভূমিকম্পের কারণ :

নিম্নলিখিত কারণে ভূমিকম্প হয়ে থাকে–

১। **শিলাচ্যুতি বা শিলাতে ভাঁজের সৃষ্টি :** কোনো কারণে পৃথিবীর অভ্যন্তরে বড় রকমের শিলাচ্যুতি ঘটলে বা শিলাতে ভাঁজের সৃষ্টি হলে ভূমিকম্প হয়। চ্যুতি ঘটার দরুন ভূত্বকের কোনো অংশ উপরে উত্থিত হয় বা নিচে বসে যায়। এ সময় চ্যুতির তলে (Fault plane) প্রবল ঘর্ষণ সৃষ্টি হয়। এ ঘর্ষণের কারণে ভূমিকম্প হয়।

২। **তাপ বিকিরণ :** ভূত্বক তাপ বিকিরণ করে সংকুচিত হলে ফাটল ও ভাঁজের সৃষ্টি হয়ে ভূমিকম্প হয়। আবার পরিচলনের মাধ্যমে উত্তপ্ত তরঙ্গের সৃষ্টি করে পৃথিবী অভ্যন্তরীণ তাপ বিকিরণ করে। এ তরঙ্গের প্রভাবে ভূমিকম্প হয়।

৩। **ভূ-পাত (Landslide) :** যদি কোনো কারণে পাহাড়-পর্বত হতে বৃহৎ শিলাখণ্ড ভূত্বকের উপরে ধসে পড়ে তবে ভূমিকম্প হয়। সাধারণত ভাঁজ পর্বতের নিকটে অধিক ভূমিকম্প হয়। কারণ, নবীন ভাঁজ পর্বতের শিলাগুলো পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত না হওয়ায় সহজেই ভূ-পাত ঘটে এবং ভূমিকম্প হয়।

Scanned with AnyScanner

৪। **ভূগর্ভস্থ বাষ্প ঃ** নানা কারণে ভূগর্ভে বাষ্পের সৃষ্টি হয়। এ বাষ্প ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলে তা ভূত্বকের নিম্নভাগে ধাক্কা দেয়। ফলে প্রচণ্ড ভূকম্পন অনুভূত হয়। এ বাষ্প ভূপৃষ্ঠের কোনো ফাটল বা কোনো দুর্বল স্থান দিয়ে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ভূকম্পন অব্যাহত থাকে।

৫। **আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঃ** অগ্ন্যুৎপাতের সময় প্রবল বেগে বাষ্প, লাভা ইত্যাদি বাহির হতে থাকে, ফলে ভূমিকম্প হয়।

৬। **ভূপৃষ্ঠের চাপ বৃদ্ধি ঃ** ভূপৃষ্ঠের উপর চাপ বৃদ্ধি পেলে তার নিচে শিলাচ্যুতি হয়েও ভূমিকম্প হয়।

৭। **হিমবাহের প্রভাব ঃ কখন কখন প্রচণ্ড হিমবাহ পর্বতগাত্র হতে সজোরে হঠাৎ নিচে পতিত হয়। ফলে ভূপৃষ্ঠ কেঁপে উঠে** এবং ভূমিকম্প হয়।

৮। **ভূ-অভ্যন্তরে ভূপৃষ্ঠস্থ পানির প্রবেশ ঃ** পানি পৃথিবীর উত্তপ্ত অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে বাষ্পে পরিণত হয়। এ বাষ্প পরিমাণে বেশি হলে তা ভূত্বকের নিচে ধাক্কা দিয়ে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে।

৯। **ভূগর্ভস্থ চাপের হ্রাস ঃ** অনেক সময় ভূগর্ভে হঠাৎ চাপের হ্রাস হলে পৃথিবীর মধ্যকার পদার্থ কঠিন অবস্থা হতে তরল অবস্থায় পরিণত হয়ে নিচে নামতে থাকে। এতেও ভূত্বক কেঁপে উঠে এবং ভূমিকম্প হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিং দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভূমিকম্পের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো টেকটোনিক প্লেটের মুভমেন্ট। ভূকম্পের উৎপত্তি স্থান বা কেন্দ্র (Focus) এর গভীরতার উপর ভিত্তি করে টেকটোনিক ভূমিকম্পের শ্রেণিবিভাগগুলো হলো–

১। **অগভীর (Shallow) ঃ** কেন্দ্রের গভীরতা 60 কিলোমিটারের মধ্যে।

২। **মধ্যম (Intermediate) ঃ** কেন্দ্রের গভীরতা 60 থেকে 70 কিলোমিটারের মধ্যে।

৩। **গভীর (Deep) ঃ** কেন্দ্রের গভীরতা 70 কিলোমিটারের বেশি।

১.৬ আরসিসি কাজ ডিজাইনে ভূকম্পিয় লোড এবং উইন্ড লোড বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of considering the seismic load and wind load in designing RCC works) ঃ

ভূমিকম্পের কেন্দ্রে বিভিন্ন আকৃতির তরঙ্গ বা কম্পন উৎপন্ন হয়, যার কারণে ভূপৃষ্ঠ অনুভূমিক এবং উল্লম্বভাবে কেঁপে উঠে বা আন্দোলিত হয়। উপরি কম্পন এবং বল প্রয়োগজনিত (Forced) কারণে আন্দোলনগুলো খুবই জটিল। এ আন্দোলনগুলোকে অনুভূমিক এবং উল্লম্বিক কম্পনে বিভক্ত করা যায়। উল্লম্বিক কম্পনের চেয়ে অনুভূমিক কম্পন অধিকতর বড় হয়। ভূমিকম্প প্রতিরোধক কাঠামোগুলো ডিজাইনে অনুভূমিক কম্পন বিবেচনা করা হয়।

ভূমিকম্পের কারণে ভূপৃষ্ঠ অনবরত অনুভূমিক এবং উল্লম্বভাবে কাঁপতে থাকে। ভূমির কম্পনের সময় ইনার্শিয়া বল কাঠামোকে সঠিক অবস্থানে রাখতে চেষ্টা করে। এ ইনার্শিয়া বা স্থানচ্যুতি বল এবং ভূমির গতি বলের মিলিত ক্রিয়ায় কাঠামোকে ধ্বংস করে দেয়। সুতরাং Seismic design এর উদ্দেশ্য হলো, আনুপাতিক হারে বলসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে কাঠামোকে স্বীয় অবস্থানে রাখা।

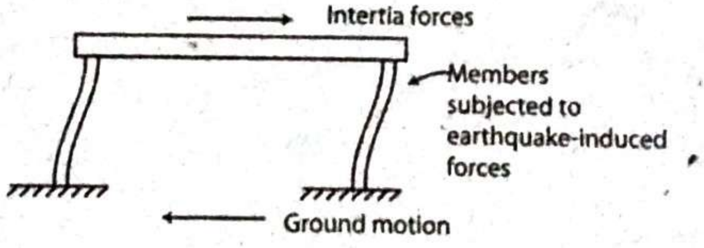

চিত্র ১.১৫ Structure subjected to ground motion

ভূমির গতিশীলতার কারণে সৃষ্ট অনুভূমিক বলকে Seismic design-এ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়। কারণ ভূকম্পনের অনুভূমিক উপাংশের মান সচরাচর উল্লম্ব উপাংশের মানের চেয়ে বেশি হয়। অভিজ্ঞতায় আরও দেখা গিয়েছে যে, অনুভূমিক উপাংশ বল অধিক ক্ষতিকারক। কাঠামো ডিজাইনে ভূমিকম্পের তীব্রতাকে ভূমির ত্বরণ হিসাবে বা অভিকর্ষ ত্বরণের ভগ্নাংশরূপে (0.1, 0.2 or 0.3g) প্রকাশ করা হয়। যদিও সর্বোচ্চ (Peak) ত্বরণ ডিজাইন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তথাপিও স্পন্দনের বৈশিষ্ট্য এবং ভূমিকম্পের স্থিতিকালও গুরুত্বপূর্ণ। ভূমিকম্পের গতির ঘন ঘন স্পন্দন (Closer frequency) স্বাভাবিক স্পন্দন বলে, কাঠামোর জন্য ক্ষতিকারক নয়। অপরদিকে, ভূমিকম্পের স্থিতিকাল বেশি হলে, তা কাঠামোর জন্য অধিক ক্ষতিকারক হয়।

Scanned with AnyScanner

ভূকম্পন প্রতিরোধী ডিজাইনের নীতিসমূহ (Principles of earthquake resistant design) ঃ
নীতিসমূহ নিম্নরূপ–

১। কাঠামো সরল আকৃতির হবে (প্ল্যান এবং এলিভেশন উভয়ই)।
২। কাঠামোর উপাদানসমূহ আনুভূমিক ভূকম্পন ক্রিয়াকে এমনভাবে বিন্যাস করতে হবে, যেন নিরাপদে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।
৩। যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাঠামোর উপাদানসমূহ বিন্যাস করতে হবে।
৪। ভূকম্পন ক্রিয়া প্রয়োগের জন্য কাঠামোর উপাদানসমূহ পর্যাপ্ত শক্তি এবং নমনীয়তা (Strength and ductility) সম্পন্ন হবে।
৫। কাঠামোর বিকৃতি সীমিত হবে।
৬। কম্পাঙ্কনের সাইটের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা।

বিভিন্নতলবিশিষ্ট কাঠামো ডিজাইনের কাজে ভূকম্পন লোড এবং উইন্ড লোড নিম্নলিখিত কারণে বিবেচনা করা হয়–

১। ভূমিকম্পের ফলে কাঠামোর যে আনুভূমিক ঝাঁকুনির সৃষ্টি হয় এর ফলে RCC কাঠামো যাতে উক্ত ঝাঁকুনি সহ্য করতে পারে সে অনুযায়ী ডিজাইন করতে হবে।
২। ভূমিকম্পের ফলে বহিরাংশিক কাঠামোতে যে বিকৃতি ঘটে তা প্রতিরোধ করার মতো ম্যাটেরিয়ালস ব্যবহার করতে হবে এবং সে অনুযায়ী ডিজাইন করতে হবে।
৩। ভূমিকম্পের সময় ইনার্শিয়া ফোর্স কাঠামোকে সঠিক স্থানে রাখতে চেষ্টা করে। এ ইনার্শিয়া ফোর্স এবং ভূমির গতি সম্বলিত ক্রিয়ায় কাঠামো ধ্বংস হয়। সুতরাং কাঠামোকে এ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আনুষঙ্গিক উপাদানসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে কাঠামোকে স্থির অবস্থানে রাখার জন্য Seismic design আবশ্যক।
৪। উইন্ড লোড কোনো কাঠামোকে উল্টিয়ে ফেলতে পারে বা আকর্ষণ করে কাঠামোটিকে তুলে নিতে পারে। উইন্ড লোড আনুভূমিকভাবে কাঠামোতে ক্রিয়া করে বিধায় ডিজাইন করার সময় উইন্ড লোড বিবেচনা করতে হবে।

চিত্র ঃ ১.১৮ Bangladesh Seismic Zone (BNBC-2020)

১.৭ ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সুনামি এবং সিডর (Cyclone, tidal, tsunami and sidr)ঃ

উপকূলবর্তী এলাকায় (Coastal zone) জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, সিডর, সুনামি ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উক্ত এলাকায় অবস্থিত বিল্ডিং/কাঠামোতে অতিরিক্ত লোড পড়ে, যা ধাক্কা (Thrust) আকারে কাজ করে। এ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধাক্কায় কাঠামোর উপর পড়ার কাঠামোতে আনুভূমিক ও উল্লম্ব উভয় প্রকার লোড আরোপিত হয়। উক্ত লোডের কারণে কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত বা অনেক হলে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়। এ কারণে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থাপনার নির্মাণের সময় এ সকল Thrust বিবেচনা করে কাঠামো ডিজাইন করতে হয়। ডিজাইন কালে অন্যান্য লোডের (যেমন– লাইভ লোড, এনভায়রনমেন্টাল লোড, উইন্ড লোড ইত্যাদি) সাথে সাথে এই সকল প্রাকৃতিক ধাক্কাসমূহ (জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, সুনামি, সিডর ইত্যাদি) বিবেচনা করে কাঠামো ডিজাইন করতে হয়।

(ক) ঘূর্ণিঝড় (Cyclone) ঃ সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ কাইক্লোস (Kyklos) থেকে। এর অর্থ সাপের কুণ্ডলী। বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণের দিক থেকে সাইক্লোন হচ্ছে নিম্নচাপ উদ্ভূত একটি এলাকা, যেখানে উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার উল্টোদিকে আর দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার অনুরূপ দিকে প্রচণ্ড বাতাস কেন্দ্রের চারপাশে প্রবাহিত হয়। বাংলাদেশ উপকূলবর্তীয় অঞ্চল বলে এখানে সাইক্লোন সবসময় ক্ষতিকারক। টুর্নিক্যাল ঝড়ের নাম আমেরিকা মহাদেশে হারিকেন, চীন ও জাপানে টাইফুন এবং বাংলাদেশসহ এ উপমহাদেশে সাইক্লোন। সমুদ্র উপকূলীয় জনসাধারণের জন্য সবচেয়ে ভয়ংকর শত্রু হলো সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সুনামি ও সিডর।

কোনো অল্প পরিসর স্থানে হঠাৎ বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে হালকা হয়ে উপরে উঠে এবং নিম্নচাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি হয়। তখন চারদিক হতে শীতল ও ভারী বায়ু প্রবল বেগে ঐ নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে ছুটে আসে এবং ঘুরতে ঘুরতে কেন্দ্রে প্রবেশ করে। এ কেন্দ্রমুখী প্রবল বায়ুপ্রবাহকেই ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন বলে।

ঘূর্ণিঝড়ের কারণ ঃ

১। সমুদ্রের উচ্চ তাপমাত্রার জন্য ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় গভীর সমুদ্রে। আর তার জন্য দরকার সমুদ্রের ২৬-২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার চেয়েও বেশি তাপমাত্রা।

২। যেখানে ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয় সেখানে প্রথমে একটি নিম্নচাপ সৃষ্টির প্রয়োজন হয়।

৩। পৃথিবীর উচ্চ বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে বাতাসের গতিবেগের বেশি তফাৎ না থাকায় ঘূর্ণিঝড়ের পক্ষে সহায়ক হয়।

বঙ্গোপসাগরে অধিকাংশ ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি হয় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি। সাধারণত বিষুবরেখা হতে পাঁচ ডিগ্রি উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশ অঞ্চলের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় না।

(খ) জলোচ্ছ্বাস ঃ ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে বাতাসের চাপ খুব কম থাকায় কেন্দ্রের কাছাকাছি অঞ্চলে সমুদ্রের পানি কিছু ফুলে উঠে, একেই জলোচ্ছ্বাস বলে। কোনো দ্বীপ অঞ্চল বা উপকূল দিয়ে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাওয়ার সময় ঝড়ের ঢেউ ও ঝড়ের জোয়ার এসে প্লাবন ঘটায়। তারপর ঝড়ের কেন্দ্র যদি কোনো স্থান দিয়ে অতিক্রম করে তবে ঝড়ের ঢেউ, ঝড়ের জোয়ার ও জলোচ্ছ্বাস– এ তিনটির সমন্বয়ে ঐ স্থানের বিরাট অংশ ডুবে যায়।

জলোচ্ছ্বাসের কারণ ঃ জলোচ্ছ্বাস ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এর কারণ সম্পর্কে বহু কল্পকথা প্রচলিত ছিল, বর্তমানে এর কারণ সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা রয়েছে। পরিবেশবাদী বিজ্ঞানীদের মতে, এ দুর্যোগের অন্যতম কারণ হচ্ছে সমুদ্রের তলদেশে ভূমিকম্পের সৃষ্টি, সমুদ্রগর্ভে লুকানো আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ, সমুদ্রের তলদেশ অগভীর হয়ে যাওয়া, গ্রীষ্মকালীন সমুদ্রে বিভিন্ন বায়ুর উষ্ণ-শীতল সংমিশ্রণে সৃষ্ট নিম্নচাপ ও বিভিন্ন কারণে পৃথিবীর ওজোন স্তরের পরিবর্তনে ভূমণ্ডল উত্তপ্ত হওয়া।

(গ) সুনামি (Tsunami) ঃ সুনামি শব্দটি soo-na-mee শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো সমুদ্রের কূল আছড়ানো বিশাল তরঙ্গ। একে আমরা Tidal wave ও বলে থাকি। ভূমিকম্প, ভূমিধস, আগ্নেয়গিরি থেকে উদগত লাভা ইত্যাদি কারণে সমুদ্রের বিপুল পানি আন্দোলিত হয়ে প্রচণ্ড ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়, যা ভূকম্পিত সামুদ্রিক ঢেউ (Seismic sea waves) বা সুনামি নামে পরিচিত। সমুদ্রে এ ঢেউ প্রতি ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার বা তার চেয়ে বেশি গতিতে অগ্রসর হতে পারে এবং ৩০ মিটার বা তার চেয়ে বেশি উচ্চতার ঢেউ তীরে আঘাত হেনে সবকিছু ধ্বংস করে দিতে পারে।

সমুদ্রের যে এলাকায় সুনামির সৃষ্টি হয়, সেখান থেকে ঢেউ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে ঢেউয়ের আঘাতে উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং এক সময় তীরে এসে আঘাত করে। ভূমিকম্পের কারণে সাধারণত সমুদ্রের তলদেশে সুনামির সৃষ্টি হয়।

সিডর (Sidr) ঃ শ্রীলঙ্কার আবহাওয়াবিদদের দেয়া সিংহলি শব্দ সিডর (Sidr), যার অর্থ চোখ। এটি সাগর থেকে সৃষ্ট হারিকেনের তীব্রতাসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড়। এ ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র দেখতে অনেকটা মানুষের চোখের মতো হওয়ায় আবহাওয়াবিদগণ এর নামকরণ করেন সিডর। তবে এ চোখ কোনো মায়াবী চাহনির চোখ নয়, যার দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থেকে অমৃতের স্বাদ উপভোগ করা যায়। এটি এমনি ভয়ঙ্কর চোখ যার, পরিবেশ তীব্র এবং নগ্ন নৃত্য ধ্বংসবিনাশ সংকেত, যার আগমনী বার্তা।

১.৮ কাঠামোগত নিরাপত্তা (Structural safety) ঃ

কোনো কাঠামো নির্মাণের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো, আরোপিতভাবে কাঠামোটি অবশ্যই ধ্বসে হওয়া (Collapse) থেকে নিরাপদ এবং ব্যবহারে টেকসই (Serviceable) থাকবে। টেকসই হতে হলে ডিফ্লেকশন খুবই নগণ্য হতে হবে। ফলে ফাটল সহনীয় পর্যায়ে থাকবে এবং কাঠামো কম্পনমুক্ত হবে। কাঠামোর উপর আরোপিত হতে পারে এমন সকল লোডের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত শক্তিসম্পন্ন হওয়া এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে উপযুক্ত হওয়াকে কাঠামোর নিরাপত্তা বলে। যদি নির্মিতব্য কাঠামো ডিজাইনকালে এর শক্তি সঠিকভাবে নিরূপিত হয় এবং অনুমানকৃত লোড ও তাদের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া, যেমন ঃ মোমেন্ট, শিয়ার, অক্ষীয় বল ইত্যাদি সঠিকভাবে নিরূপিত হয়, তবে সার্ভিস লোডের চেয়ে অতিরিক্ত লোডের জন্য বহনক্ষম করে ডিজাইন করলেই কাঠামোটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে। তবে বাস্তবে অনিশ্চয়তার অনেকগুলো উৎস রয়েছে; যেমন– কাঠামোর অ্যানালাইসিস, ডিজাইন এবং আরসিসি নির্মাণপদ্ধতি। এ সকল অনিশ্চয়তার উৎসগুলোর জন্য সুনির্ধারিত নিরাপত্তা সহগের প্রয়োজন।

নিরাপত্তা সহগের প্রয়োজনীয়তা বা অনিশ্চয়তার উৎসগুলো নিম্নরূপ–

১। ডিজাইনকালে আনুমানিক লোড এবং প্রকৃত লোড (সার্ভিস লোড) এর মধ্যে পার্থক্য হতে পারে।
২। প্রকৃত লোডের বিস্তৃতির ধরন এবং ডিজাইনে অনুমানকৃত লোডের বিস্তৃতির মধ্যে ভিন্নতা থাকতে পারে।
৩। ডিজাইনকালে নিরূপিত মোমেন্ট, শিয়ার ইত্যাদি বাস্তবে উদ্ভূত মোমেন্ট, শিয়ার ইত্যাদির মধ্যে প্রভেদ হতে পারে।
৪। জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে ডিজাইনকালে কাঠামোর আচরণ সম্পর্কিত ধারণা বাস্তব আচরণ হতে ভিন্ন হতে পারে।
৫। ডিজাইনকালে নির্ণীত কাঠামোর পরিমাপ বাস্তবে প্রয়োজনীয় পরিমাপের তুলনায় পর্যাপ্ত নাও হতে পারে।
৬। রিইনফোর্সমেন্ট সঠিক অবস্থানে স্থাপিত নাও হতে পারে।
৭। ডিজাইনকালে বিভিন্ন উপাদানের ধারণাকৃত সামর্থ্য, বাস্তবক্ষেত্রে নির্মাণসামগ্রীর সামর্থ্য একইরূপ নাও হতে পারে।

এ ছাড়া নিরাপদ অনুবিধি প্রণয়নের সময়, কোনো কাঠামো ভেঙ্গে বা ধ্বসে পড়লে এর ক্ষতির তীব্রতাও বিবেচনা করা উচিত। কেননা কোনো কাঠামো ভেঙ্গে পড়লে এটা তেমন কোনো গুরুত্ব বহন করে না; আবার কোনো কাঠামো ভেঙ্গে পড়লে এটা সমূহ ক্ষতির কারণ হয়, অর্থাৎ অনেক জীবনহানি এবং সম্পদহানি ঘটে। তাই কাঠামো ভেঙ্গে পড়ার প্রকৃতিও বিবেচনা করা উচিত। কেননা হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ার চেয়ে ধীরে ধীরে ব্যর্থ হওয়া কাঙ্ক্ষিত, যাতে প্রতিরোধের জন্য যথেষ্ট সময় ও সুযোগ পাওয়া যায়।

সুতরাং কাঠামো ডিজাইনে উপরোক্ত বিষয়াদি বিবেচনাপূর্বক উপযুক্ত নিরাপদ সীমারেখা নির্বাচন করা আবশ্যক। কাঠামো ডিজাইনে নিরাপদ সীমারেখা নিম্নের সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়–

$$M = S - L > O$$

যেখানে, M = নিরাপদ সীমা
S = ডিজাইন স্ট্রেংথ
L = কার্যকরী শক্তি

নিরাপদ সীমা (M) অবশ্যই শূন্য অপেক্ষা বেশি হওয়া উচিত। নিরাপদ সীমা শূন্য অপেক্ষা কম হলে নির্মিত কাঠামো কার্যকরীভাবে ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা সমধিক।

অন্যভাবে, যেসব কাঠামোতে ক্রমবর্ধনে হারে লোড আপতিত অথবা প্রয়োগ করা হয়, সেক্ষেত্রে–

$$\text{নিরাপদ সহগ} = \frac{\text{ইলাস্টিক লিমিট}}{\text{ওয়ার্কিং স্ট্রেস}} = 2 \text{ থেকে } 2.5 \text{ ধরা হয়।}$$

আবার যেসব কাঠামোতে হঠাৎ লোড আপতিত বা প্রয়োগ করা হয়, সেক্ষেত্রে–

$$\text{নিরাপদ সহগ} = \frac{\text{ইলাস্টিক লিমিট}}{\text{ওয়ার্কিং স্ট্রেস}} = 4 \text{ থেকে } 6 \text{ ধরা হয়।}$$

১.৮.১ কাঠামো ডিজাইনে নিরাপদ অনুবিধি (Safety provision for structural design) ঃ

(ক) ডিজাইন ভিত্তি (Design basis) ঃ

যে-কোনো ধরনের কাঠামো মেম্বারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক বৈশিষ্ট্য হলো এর প্রকৃত সামর্থ্য (Strength) নিরূপণ, যা কাঠামোর আয়ুষ্কালে সম্ভাব্য সকল প্রকার ভারে ভেঙ্গে পড়া বা অন্য কোনোরূপ ক্ষয়ক্ষতি ব্যতিরেকে নিরাপদে বহন করার মতো যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন হয়। তাই রিইনফোর্সড কংক্রিট কাঠামো মূলত দুই পদ্ধতিতে ডিজাইন করা হয়, যথা–

১। ওয়ার্কিং স্ট্রেস ডিজাইন (Working Stress Design সংক্ষেপে W.S.D.) পদ্ধতি
২। আল্টিমেট স্ট্রেংথ ডিজাইন (Ultimate Strength Design সংক্ষেপে U.S.D) পদ্ধতি।

Scanned with AnyScanner

১। ওয়ার্কিং স্ট্রেস ডিজাইন (WSD) পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতিতে কংক্রিটের ও স্টিলের ইলাস্টিক রেঞ্জের সর্বোচ্চ সীমা মোতাবেক অনুমোদিত স্ট্রেস (Working stress বা allowable stress) এর ভিত্তিতে কংক্রিটের পরিমাণ এবং স্টিলের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। এতে নির্মাণসামগ্রীর সর্বোচ্চ স্ট্রেসের একটি ভগ্নাংশকে অনুমোদনযোগ্য স্ট্রেস হিসাবে ধরে নেয়া হয়। যেমন ঃ কংক্রিটের ইলাস্টিক রেঞ্জের সর্বোচ্চ সীমার ভিত্তিতে অনুমোদিত স্ট্রেস এর সর্বোচ্চ শক্তি (Ultimate strength) এর প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ প্রায় 45% এবং স্টিলের অনুমোদিত স্ট্রেস-এর নমনীয় শক্তি (Yield strength) এর প্রায় 40% ধরা হয়। কাঠামোর মেম্বারগুলোকে এরূপভাবে ডিজাইন করা হয়, যাতে ওয়ার্কিং (সার্ভিস) লোড প্রয়োগে কখনো ওয়ার্কিং স্ট্রেসের অতিরিক্ত স্ট্রেস কাঠামোতে উৎপন্ন না হয়। কাঠামোর প্রকৃত নিশ্চলভার (Dead load) এবং কাঠামোর আয়ুকালে আপতিত হিসাবকৃত সর্বোচ্চ লাইভ লোডের সমষ্টিকে সার্ভিস লোড বা ওয়ার্কিং লোড হিসাবে ধরা হয়।

সুতরাং, ওয়ার্কিং লোডের জন্য উৎপন্ন ওয়ার্কিং স্ট্রেসকে অনুমোদনযোগ্য স্ট্রেস হিসাবে ধরে যে ডিজাইন করা হয়, তাকে ওয়ার্কিং স্ট্রেস ডিজাইন বা সার্ভিস লোড স্ট্রেস ডিজাইন বলে। অনুমোদনযোগ্য স্ট্রেস হিসাবে সর্বদা স্টিলের ইল্ড স্ট্রেস এবং কংক্রিটের চাপ শক্তির একটি ভগ্নাংশকে ধরে নেয়া হয়।

কংক্রিটের পীড়ন-বিকৃতি কার্ভের সাহায্যে দেখা যায়, কংক্রিটের স্ট্রেন 0.001 পর্যন্ত ইলাস্টিক হয়ে থাকে। ফলে রিইনফোর্সড কংক্রিট মেম্বারে কংক্রিটের স্ট্রেস ডায়াগ্রাম ত্রিভুজাকার হয়ে থাকে। নিরপেক্ষ অক্ষে স্ট্রেসের পরিমাণ সর্বনিম্ন এবং সর্বাধিক দূরবর্তী কম্প্রেশন ফাইবারে স্ট্রেসের পরিমাণ সর্বোচ্চ হয়ে থাকে। ওয়ার্কিং স্ট্রেস ডিজাইন পদ্ধতিতে এরূপ পীড়ন-বিকৃতি বিতরণের উপর ভিত্তি করে করা হয় বলে কখনও ওয়ার্কিং লোড অতিক্রম করে না। এ পদ্ধতিতে সকল ধরনের লোডকে একই প্রকার পরিবর্তনশীল এবং অনিশ্চয়তার আওতাভুক্ত ধরা হয়। ওয়ার্কিং লোড আরসিসি কাঠামো ধ্বংস হওয়া থেকে পর্যাপ্ত নিরাপদে থাকে। তবে যেহেতু এ পদ্ধতিতে লোডের স্বতন্ত্র পার্থক্য (Individual variability) ও অনিশ্চয়তা (Uncertainity) বিবেচনা করা হয় না, সেহেতু নিরাপদ মার্জিন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানে সহায়ক হয় না।

২। আল্টিমেট স্ট্রেংথ ডিজাইন (USD) পদ্ধতি ঃ কংক্রিট ও স্টিলের সর্বোচ্চ শক্তির (Ultimate strength) ভিত্তিতে কাঠামোর (বিম, স্ল্যাব ইত্যাদি) প্রস্থচ্ছেদ এবং স্টিলের পরিমাণ নির্ণায়ক ডিজাইন পদ্ধতিকে আল্টিমেট স্ট্রেংথ ডিজাইন (USD) বলা হয়। কংক্রিট এবং স্টিলের সর্বোচ্চ শক্তি তাদের ইন-ইলাস্টিক রেঞ্জে (Inelastic range) ব্যর্থ হওয়ার মুহূর্তে অথবা ব্যর্থ হওয়ার পূর্বমুহূর্তে স্ব স্ব আচরণ অনুযায়ী নিরূপিত হয়। এ পদ্ধতিতে সকল ধরনের লোডের স্বতন্ত্র পার্থক্য ও অনিশ্চয়তা বিবেচনাপূর্বক নিরাপদ মার্জিন সমন্বয় করা হয় বলে নিরাপদ মার্জিন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়।

USD এবং WSD এর মধ্যে তুলনা ঃ

USD	WSD
১। এ পদ্ধতিতে পদার্থের ইন-ইলাস্টিক আচরণের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ শক্তি ধরে ডিজাইন করা হয়।	১। এ পদ্ধতিতে পদার্থের ইলাস্টিক আচরণের ভিত্তিতে অনুমোদনযোগ্য পীড়ন ধরে ডিজাইন করা হয়।
২। বিভিন্ন প্রকার লোডের স্বতন্ত্র পার্থক্য ও অনিশ্চয়তা বিবেচনা করা হয়।	২। সকল ধরনের লোডকে একই প্রকার পরিবর্তনশীল এবং অনিশ্চয়তা বিবেচনা করা হয়।
৩। কাঠামোর নিরাপদ মার্জিন (Safety margin) সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়।	৩। কাঠামোর নিরাপদ মার্জিন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদানে সহায়ক হয় না।
৪। পদার্থের পূর্ণ স্ট্রেংথ ব্যবহারের জন্য আন্ডার রিইনফোর্সড হিসাবে ডিজাইন করা হয়।	৪। অনুমোদনযোগ্য স্ট্রেস হিসাবে পদার্থের শক্তির একটি ভগ্নাংশ ব্যবহার করা হয় বলে অধিকাংশ সেকশনই ব্যালেন্সড অথবা ওভার রিইনফোর্সড হয়ে থাকে।
৫। এটা সাশ্রয়ী ডিজাইন।	৫। এটা U.S.D.-এর তুলনায় অসাশ্রয়ী ডিজাইন।
৬। ডিজাইন পদ্ধতি বিভিন্ন পরীক্ষণ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।	৬। ডিজাইন পদ্ধতি মেকানিক্স-এর সূত্রনির্ভর এবং এটা গাণিতিকভাবে সম্পাদন করা হয়।
৭। কাঠামো ডিজাইনে পদার্থদ্বয়ের টেস্ট-স্ট্রেংথ ব্যবহার করা হয়।	৭। কাঠামো ডিজাইনে পদার্থদ্বয়ের মডুলার রেশিও ব্যবহার করা হয়।
৮। এটা আধুনিক পদ্ধতি।	৮। এটা মূলত পুরাতন পদ্ধতি।

Scanned with AnyScanner

(খ) নিরাপদ অনুবিধি (Safety Provision) :

ACI কোড রিইনফোর্সড কংক্রিট কাঠামো ডিজাইনে দু'ভাবে নিরাপদ অনুবিধির উল্লেখ করেছে, যেমন–

১। ওয়ার্কিং স্ট্রেস ডিজাইন (WSD) পদ্ধতি,

২। আল্টিমেট স্ট্রেংথ ডিজাইন (USD) পদ্ধতি।

১। ওয়ার্কিং স্ট্রেস ডিজাইন পদ্ধতি (Working stress design) : এ পদ্ধতিতে কংক্রিটের ও স্টিলের স্থিতিস্থাপক সীমা সর্বোচ্চ স্ট্রেংথ এর ভিত্তিতে নিরাপদ সহগের মাধ্যমে অনুমোদনযোগ্য পীড়ন নির্ণয় করা হয়। এক্ষেত্রে নিরাপদ সহগের মান 2 থেকে 2.5 ধরা হয়। কংক্রিটের ক্ষেত্রে নিরাপদ সহগ অর্থাৎ বিচূর্ণন লোড এবং ওয়ার্কিং লোডের অনুপাত সাধারণত 2.25 ধরা হ অপরদিকে, স্টিলের ক্ষেত্রে নিরাপদ সহগের মান ধরা হয় 2.5।

২। আল্টিমেট স্ট্রেংথ ডিজাইন পদ্ধতি (Ultimate strength design) : এ পদ্ধতিতে প্রকৌশলীগণের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত বিষয়াদি, অকল্পনীয় ও আকস্মিক লোড, উপকরণাদির সার্বিক গুণাগুণের তারতম্য, কাঠামোর গুরুত্ব, ধসে পড়ার সম্ভাব্য ক্ষতির তীব্রতা ইত্যাদি বিষয়াবলি থেকে উত্তরণের জন্য নিরাপদ সহগের পরিবর্তে সর্বোচ্চ শক্তি বিবেচনা করা হয়। ফলে উপযুক্ত নিরাপদ মার্জিনের ভিত্তিতে ডিজাইন করা হয়। এ পদ্ধতিতে পৃথকভাবে ওভারলোড ফ্যাক্টর (Y) এবং ক্যাপাসিটি রিডাকশন ফ্যাক্টর (ϕ) গ্রহণ করে ডিজাইন স্ট্রেংথ নির্ণয় করা হয়। কোনো কাঠামোর ডিজাইন স্ট্রেংথ, (ϕS_n) কমপক্ষে তার ফ্যাক্টর লোড (Factor Load) হতে নিরূপিত প্রয়োজনীয় স্ট্রেংথ, U এর সমান হবে। অর্থাৎ–

ডিজাইন স্ট্রেংথ > প্রয়োজনীয় স্ট্রেংথ বা $\phi S_n > U$

যেখানে, S_n = নমিনাল স্ট্রেংথ

ϕ = স্ট্রেংথ রিডাকশন ফ্যাক্টর

U = ফ্যাক্টর লোড হতে নিরূপিত প্রয়োজনীয় স্ট্রেংথ।

১.৮.২ ডিজাইন কোড (Design code) :

আরসিসি ডিজাইন বিনির্দেশাবলি কোড বা অনুমোদিত নীতিমালা আকারে প্রকাশ করা হয়, যা বিশেষ ধরনের কংক্রিট স্ট্রাকচার ডিজাইন ও বিশ্লেষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পেশাভিত্তিক গ্রুপ, ব্যবসায়ী সংস্থা, কারিগরি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিধিবদ্ধ আইন আকারে এটা প্রকাশিত হয়। জনসাধারণকে বিপদ হতে রক্ষার্থে বা কাঠামোর নিরাপত্তাজনিত সাধারণ ত্রুটি দূরীকরণার্থে এতে সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয়তা বিনির্দেশিত থাকে। নিম্নে বিশেষ বিশেষ কোডগুলো প্রদান করা হলো–

1. বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC) রয়েছে, যা ১৯৯৩ সালে "বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড" নামে প্রথম প্রণয়ন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২০ সালে সংশোধিত BNBC–2020 গেজেটেড হয়।
2. যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বিখ্যাত এবং গুরুত্বপূর্ণ কোড হলো "আমেরিকান কংক্রিট ইনস্টিটিউট" (American Concrete Institute) এর "বিল্ডিং কোড রিকুয়ারমেন্ট ফর রিইনফোর্সড কংক্রিট" (ACI 318–63)। একে সংক্ষেপে এসিআই কোড (ACI code)-ও বলা হয়। নির্মাণক্ষেত্রে এটা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়াও এসিআই গুরুত্বপূর্ণ জার্নাল ও ম্যানুয়াল প্রকাশ করে।
3. যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাটেরিয়াল টেস্টিং-এর ক্ষেত্রে বিখ্যাত সংস্থা হলো "আমেরিকান সোসাইটি ফর টেস্টিং ম্যাটেরিয়ালস" (American Society for Testing Materials)। একে সংক্ষেপে এএসটিএম (ASTM) বলা হয়।
4. মহাসড়ক ও ব্রিজ ডিজাইনে "আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব স্টেট হাইওয়ে অফিশিয়ালস"(American Association of State Highway Officials -সংক্ষেপে AASHO কোড অনুসৃত হয়।
5. রেলওয়ে ব্রিজ, ম্যাশনারি স্ট্রাকচার ও রিইনফোর্সড কংক্রিট ডিজাইনে "আমেরিকান রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসোসিয়েশন" (American Railway Engineering Association)-সংক্ষেপে AREA রচিত কোড অনুসৃত হয়।

কোড সর্বদা প্রকৌশলীদের গাইড হিসাবে কাজ করে। ACI কোড বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বের অধিকাংশ দেশে সফলতার সাথে ব্যবহৃত হচ্ছে।

Scanned with AnyScanner